ইস্কনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র
অমৃতের সন্ধানে
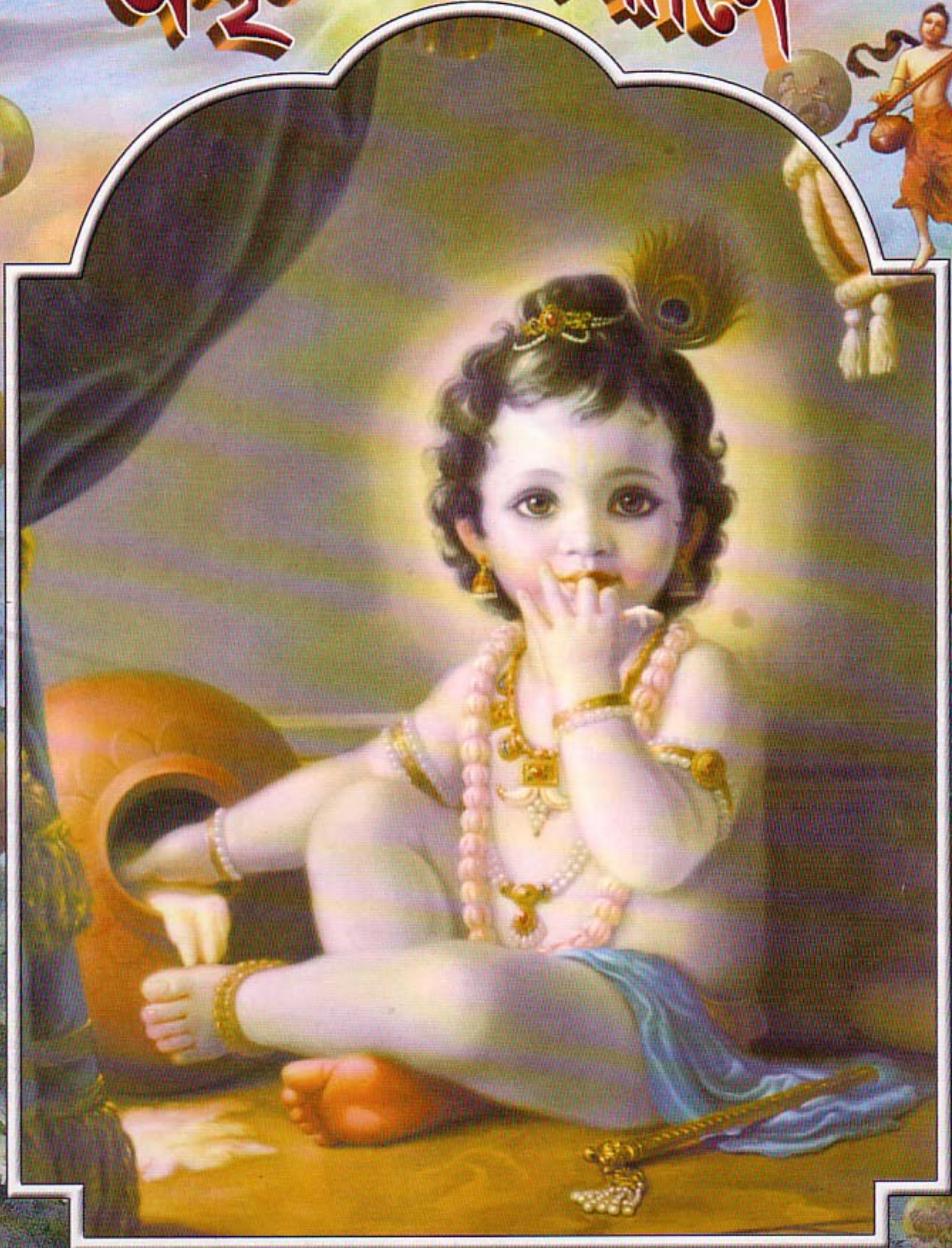
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের

প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

দশম বর্ষ ❒ চতুর্থ সংখ্যা ❒ অক্টোবর ❒ নভেম্বর ❒ ডিসেম্বর ২০০৫ ইং

প্রতিষ্ঠাতা ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ(ইস্‌কন) এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে, বাংলাদেশ ইস্‌কন গভর্নিংবডি কমিশনার ও গুরুবর্গের কৃপায়

সম্পাদক ঃ শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী
নির্বাহী সম্পাদক ঃ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ দাস ব্রহ্মচারী
সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রী অজিতেষ কৃষ্ণ দাস

বাংলাদেশ ইস্‌কন ফুড ফর লাইফ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রধান উপদেষ্টা ঃ শ্রী ননী গোপাল সাহা
বিশেষ উপদেষ্টা ঃ শ্রী সত্যরঞ্জন বাড়ৈ, অবসরপ্রাপ্ত ডি আই জি (অবসরপ্রাপ্ত)
পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ শ্রী চিত্ত রঞ্জন পাল
শ্রী সুদর্শন কৃষ্ণ দাস

স্বত্ত্বাধিকারী ঃ ইস্‌কন্ ফুড ফর লাইফ
ভিক্ষা মূল্য ঃ প্রতি কপি- ১৫.০০ টাকা
এবং বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা-
১। সাধারণ ডাকে - ৭০.০০
২। রেজিঃ ডাকে - ৯০.০০
মুদ্রণে ঃ নয়ন গ্রাফিক্, টিপু সুলতান রোড, ঢাকা।
কম্পোজ ঃ কম্পিউটার এন্ড ডিজাইন, শাঁখারী বাজার, ঢাকা।

যোগাযোগ করুন

'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে'
৭৯, ৭৯/১, স্বামীবাগ রোড,
ঢাকা-১১০০, ফোন ঃ ৭১২২৪৮৮

'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে'
৫ চন্দ্রমোহন বসাক স্ট্রীট,
বনগ্রাম (ওয়ারী) ঢাকা-১২০৩
ফোন ঃ ৭১১৬২৪৯

প্রচ্ছদপট

এক সময়ে বৃন্দাবনে মা যশোদা যখন নিজে দধি মন্থন করছিলেন, তখন শিশু কৃষ্ণ ক্ষুধার্ত হলে মা যশোদা তাঁকে কোলে নিয়ে স্তন্য দান করলেন। সেই মুহূর্তে আগুনে বসানো দুধ উৎলিয়ে পড়লে মা যশোদা কৃষ্ণকে কোল থেকে নামিয়ে সেদিকে ছুটলেন। তখন কৃষ্ণ রাগে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে পাথরের টুকরো দিয়ে ননীর ভান্ডটি ভেঙ্গে ফেললেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে গৃহের এক নির্জন কোণে বসে সেই ননী খেতে লাগলেন।

বৈষ্ণব পঞ্জিকা

গৌরাব্দ ঃ ৫১৯ ; বঙ্গাব্দ ঃ ১৪১১-১৪১২ ; খ্রীষ্টাব্দ ঃ ২০০৫-২০০৬

২৭শে আশ্বিন ১৩ই অক্টোবর, বৃহস্পতিবার ঃ শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের বিজয়োৎসব। শ্রীপাদ মধ্বাচার্যের আবির্ভাব।

২৮শে আশ্বিন ১৪ই অক্টোবর, শুক্রবার ঃ পাশাঙ্কুশা একাদশীর উপবাস। শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর তিরোভাব। শ্রীল রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামীর তিরোভাব।

২৯শে আশ্বিন ১৫ই অক্টোবর, শনিবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ৫.৫৬ মিঃ থেকে ৯.৪৮ মিঃ মধ্যে।

৩১শে আশ্বিন ১৭ই অক্টোবর, সোমবার ঃ শ্রীকৃষ্ণের শারদীয় রাসযাত্রা। লক্ষ্মী পূজা। চাতুর্মাস্যের চতুর্থ মাস শুরু। একমাস মাষকলাই ও সরিষা তৈল বর্জন। শ্রীল মুরারিগুপ্তের তিরোভাব।

৫ই কার্তিক ২২শে অক্টোবর, শনিবার ঃ শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের তিরোভাব।

৮ই কার্তিক ২৫শে অক্টোবর, মঙ্গলবার ঃ শ্রীরাধাকুণ্ডের আবির্ভাব। বহুলাষ্টমী।

১১ই কার্তিক ২৮শে অক্টোবর, শুক্রবার ঃ পরমা একাদশীর উপবাস।

১২ই কার্তিক ২৯শে অক্টোবর, শনিবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ৬.০৩ মিঃ থেকে ৯.৪৯ মি মধ্যে।

১৬ই কার্তিক ২রা নভেম্বর, বুধবার ঃ দীপাবলী, দীপদান (কালিপূজা)

১৭ই কার্তিক ৩রা নভেম্বর, বৃহস্পতিবার ঃ শ্রীশ্রীগোবর্দ্ধন পূজা, গো-পূজা ও গো-ক্রীড়া। বলিদৈত্যরাজ পূজা। শ্রীল রসিকানন্দের আবির্ভাব।

১৮ই কার্তিক ৪ঠা নভেম্বর, শুক্রবার ঃ শ্রীল বাসুদেব ঘোষের তিরোভাব।

১৯শে কার্তিক ৫ই নভেম্বর, শনিবার ঃ শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের তিরোভাব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

২৩শে কার্তিক ৯ই নভেম্বর, বুধবার ঃ শ্রীগোপাষ্টমী ও গোষ্ঠাষ্টমী। শ্রীল গদাধর দাস গোস্বামী, শ্রীল ধনঞ্জয় পণ্ডিতের এবং শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য প্রভুর তিরোভাব।

২৪শে কার্তিক ১০ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার ঃ শ্রীশ্রী জগদ্ধাত্রী পূজা।

২৬শে কার্তিক ১২ই নভেম্বর, শনিবার ঃ শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব। শ্রীভীষ্মপঞ্চক শুরু (৫ দিন)। দুপুর পর্যন্ত উপবাস। উত্থান একাদশীর উপবাস।

২৭শে কার্তিক ১৩ই নভেম্বর, রবিবার ঃ একাদশীর পারণ পূবাহ্ন ৬.১৩ মিঃ থেকে ৯.৫৩ মিঃ মধ্যে।

৩০শে কার্তিক ১৬ই নভেম্বর, বুধবার ঃ শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। তুলসী-শালগ্রাম বিবাহ। চাতুর্মাস্য ব্রত এবং নিয়মসেবা সমাপ্ত। শ্রীল নিম্বার্ক আচার্যের আবির্ভাব।

১১ই অগ্রহায়ণ ২৭শে নভেম্বর, রবিবার ঃ উৎপন্না একাদশীর উপবাস। শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরের তিরোভাব।

১২ই অগ্রহায়ণ ২৮শে নভেম্বর, সোমবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ৬.২৪ মিঃ থেকে ১০.০০ মিঃ মধ্যে। শ্রীল কালীয়কৃষ্ণ দাসের তিরোভাব।

২১শে অগ্রহায়ণ ৭ই ডিসেম্বর, বুধবার ঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ওড়ন ষষ্ঠী।

২৫শে অগ্রহায়ণ ১১ই ডিসেম্বর, রবিবার ঃ মোক্ষদা একাদশীর উপবাস। শ্রীমদ্ভবদগীতা জয়ন্তী উৎসব।

২৬শে অগ্রহায়ণ ১২ই ডিসেম্বর, সোমবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ৬.৩৩ মিঃ থেকে ১০.০৭ মিঃ মধ্যে।

২৯শে অগ্রহায়ণ ১৫ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার ঃ কাত্যায়ণী ব্রত সমাপ্ত।

৩রা পৌষ ১৯শে ডিসেম্বর, সোমবার ঃ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

৯ই পৌষ ২৫শে ডিসেম্বর, রবিবার ঃ শ্রীল সুভগ স্বামী মহারাজের আবির্ভাব। (শ্রীব্যাসপূজা)

১১ই পৌষ ২৭শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার ঃ সফলাএকাদশীর উপবাস। শ্রীল দেবানন্দ পণ্ডিতের তিরোভাব।

১২ই পৌষ ২৮শে ডিসেম্বর, বুধবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ৬.৪১ মিঃ থেকে ১০.২৫ মিঃ মধ্যে।

১৭ই পৌষ ২রা জানুয়ারী, সোমবার ঃ শ্রীল জীবগোস্বামী ও শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব

২৫শে পৌষ ১০ই জানুয়ারী, মঙ্গলবার ঃ পুত্রদা একাদশীর উপবাস।

২৬শে পৌষ ১১ই জানুয়ারী, বুধবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ৬.৪৫ মিঃ থেকে ১০.২০ মিঃ এর মধ্যে। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের আবির্ভাব।

২৯শে পৌষ ১৪ই জানুয়ারী, শনিবার ঃ শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক। মকর সংক্রান্তি, গঙ্গাসাগর মেলা।

৫ই মাঘ ১৯শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার ঃ শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজের তিরোভাব। শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামীর আবির্ভাব।

১২ই মাঘ ২৬শে জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার ঃ ষট্‌তিলা একাদশীর উপবাস।

১৩ই মাঘ ২৭শে জানুয়ারী, শুক্রবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ৬.৪৩ মিঃ থেকে ১০.২০ মিঃ মধ্যে।

১৯শে মাঘ ২রা ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার ঃ শ্রীকৃষ্ণের বসন্ত পঞ্চমী। শ্রী সরস্বতী পূজা। শ্রীমতি বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব। শ্রীল পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীল রঘুনন্দন দাস ঠাকুর ও শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর আবির্ভাব এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের তিরোভাব।

২১শে মাঘ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, শনিবার ঃ শ্রীল অদ্বৈত আচার্যের আবির্ভাব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

২২শে মাঘ ৫ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার ঃ ভীষ্মাষ্টমী।

২৫শে ৮ই ফেব্রুয়ারী, বুধবার ঃ ভৈমী একাদশীর উপবাস। দুপুরের পর অনুকল্প গ্রহণীয়।

২৬শে মাঘ ৯ই ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ৮.৪১ মিঃ থেকে ১০,২২ মিঃ মধ্যে। শ্রীবরাহদেবের আবির্ভাব।

২৭শে মাঘ ১০ই ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার ঃ শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস।

৩০শে মাঘ ১৩ই ফেব্রুয়ারী, সোমবার ঃ শ্রীকৃষ্ণের মধুর উৎসব। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরের আবির্ভাব। কুম্ভসংক্রান্তি।

৫ই ফাল্গুন ১৮ই ফেব্রুয়ারী, শনিবার ঃ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব। দুপুর পর্যন্ত উপবাস। শ্রীল গৌরগোবিন্দ স্বামীর তিরোভাব।

১১ই ফাল্গুন ২৪শে ফেব্রুয়ারী, শুক্রবার ঃ বিজয়া একাদশীর উপবাস

১২ই ফাল্গুন ২৫শে ফেব্রুয়ারী, শনিবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ৬.২৫ মিঃ থেকে ১০.১৭ মিঃ মধ্যে। শ্রীল ঈশ্বরপুরীদের তিরোভাব।

১৪ই ফাল্গুন ২৭শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার ঃ শ্রীশিবরাত্রি।

১৫ই ফাল্গুন ২৮শে ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার ঃ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী ও শ্রীল রসিকানন্দ প্রভুর তিরোভাব। শ্রীল তমালকৃষ্ণ গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব।

২৫শে ফাল্গুন ১০ই মার্চ ২০০৬, শুক্রবার ঃ আমলকী একাদশীর উপবাস।

২৬ ফাল্গুন ১১ই মার্চ ২০০৬, শনিবার ঃ একাদশীর পারণ পূর্বাহ্ন ৬.১৩ মিঃ থেকে ১০.১১ মিঃ মধ্যে শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর তিরোভাব।

২৯শে ফাল্গুন ১৪ই মার্চ ২০০৬, মঙ্গলবার ঃ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভুর আবির্ভাব। গৌরপূর্ণিমা। চন্দ্রোদয় পর্যন্ত নির্জলা উপবাস পরে অনুকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।

 ধর্মাচারী-মধ্যে বহুত 'কর্মনিষ্ঠ'। কোটি-কর্মনিষ্ঠ-মধ্যে এক 'জ্ঞানী' শ্রেষ্ঠ॥

কৃষ্ণের অনুকূলে ভক্তি অনুশীলন

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ-আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য
১৯৭২ সালে ২৬ ডিসেম্বর বোম্বে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৬/১/২৭) প্রবচন থেকে সংকলিত।

প্রদ্যুম্ন ঃ (পাঠ) "........দবিরখাস, যিনি পরবর্তীকালে শ্রীল সনাতন গোস্বামী নামে পরিচিত হয়েছিলেন, তিনি রূপ গোস্বামীর গচ্ছিত টাকাটি কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ দিয়ে হুসেন শাহের কারাগার থেকে মুক্ত হন। এইভাবে দুই ভাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হলেন। শ্রীল রূপ গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রথম মিলন হয় প্রয়াগে (এলাহাবাদ, ভারত) এবং সেই পুণ্যতীর্থের দশাশ্বমেধ ঘাটে মহাপ্রভু তাঁকে দশদিন ধরে পারমার্থিক তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন।......

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এখন মাঝে মাঝে প্রশ্ন ওঠে যে শ্রীল সনাতন গোস্বামী অবৈধভাবে টাকা দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, প্রকৃতই তিনি তা দিয়েছিলেন; নবাব হুসেন শাহ যখন তাঁকে কারারুদ্ধ করেন, তখন তিনি ছিলেন নবাবের মন্ত্রী। কারাধ্যক্ষ তখন তাঁরই অধীনে কর্মরত ছিলেন। এখন সেই সনাতন গোস্বামী তাঁকে অনুরোধ করে বলছেন যে "আমি বহুবার আপনার উপকার করেছি। এখন আপনি আমার শুধু একটি উপকার করুন। আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, নবাব আমাকে কারারুদ্ধ করলেও আপনি আমাকে মুক্ত করে দিন। আমি পীর হব।" কারণ মুসলমানেরা পীরকে খুবই শ্রদ্ধা করে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তিনি পীর হতে চেয়েছিলেন। তাঁরা সংসার জীবন ত্যাগ করে গোস্বামী হয়েছিলেন। "সুতরাং ভগবানের উদ্দেশ্যে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করছি। এই কাজে আপনি আমাকে সাহায্য করুন। শুধু তাই নয়, এই কাজের জন্য আপনার কিছু অর্থ প্রাপ্তিও হবে।" প্রথমে তিনি কারাধ্যক্ষকে পাঁচ সহস্র স্বর্ণমুদ্রা (?) দান করতে চাইলেন। কিন্তু এতেও কারাধ্যক্ষকে প্রসন্ন না দেখে তিনি মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়ে দশ সহস্র করলেন। এইভাবে ব্যাপারটির একটা ফয়সালা হল এবং কারাধ্যক্ষ তাঁকে ছেড়ে দিলেন। তারপর কারাধ্যক্ষ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর কাছে জানতে চাইলেন "নবাব যখন ব্যাপারটির জন্য আমাকে তলব করবেন, তখন আমি নবাবকে কি বলব ? আপনি তো চলে যাচ্ছেন।" তিনি তখন কারাধ্যক্ষকে একটি কৌশল শিখিয়ে দিলেন। তখনকার দিনে লোকেরা খোলা মাঠে মলত্যাগ করত। তিনি কারারুদ্ধ কয়েদি তাই মাঠে মল ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করলে কারাধ্যক্ষ তাঁর সঙ্গে গেলেন।

এইভাবে মিথ্যা গল্প ফাঁদলেন "শৌচ কর্মে গিয়ে হঠাৎ তিনি নদীতে ঝাঁপ দিলে নদীর প্রবল স্রোতে তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমি আর তাঁকে খুঁজে পেলাম না।" এভাবেই শ্রীল সনাতন গোস্বামী উৎকোচ দিয়ে কারাগৃহ থেকে পলায়ন করেন।

এখন প্রশ্ন হল আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য এই ধরনের অবৈধ কাজ, উৎকোচ প্রদানের কতটা প্রয়োজন। এর উত্তর হল, সব কিছুই করা চলতে পারে যদি কৃষ্ণের তুষ্টির জন্য তা করা হয়। এটাই তত্ত্ব। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ চলছে। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে আছেন, তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলছেন, "তুমি দ্রোণাচার্যকে গিয়ে বলো যে, আপনার পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যু হয়েছে।" দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা বলতে পরামর্শ দিচ্ছেন। যুধিষ্ঠির ইতস্ততঃ করছেনঃ 'কি করে মিথ্যা বলব ? জীবনে কখনও মিথ্যা বলিনি।' ভাবটা এই যে সাধারণ অবস্থায় আমাদের ব্যবহার......কিন্তু যখন যুদ্ধ লাগে তখন সমস্ত রকম উপায় অবলম্বন করা যায়। যুদ্ধে একমাত্র লক্ষ্য হল জয় লাভ। যদিও কিছু আন্তর্জাতিক আইন আছে, কিন্তু যুদ্ধ লাগলে সেসব কেউ গ্রাহ্য করে না। যেমন বোমা বর্ষণের ক্ষেত্রে যে নিয়ম আছে তা পালন করা হয় না। কখনও কখনও বিপক্ষ দল রেডক্রশ বাহিনীর অধীনে সৈন্য পোষণ করে, কারণ আন্তর্জাতিক আইন মোতাবেক রেডক্রশ বাহিনীর ওপর বোমাবর্ষণ নিষিদ্ধ। কিন্তু বিপক্ষ দল গোপনে তথ্য সংগ্রহ করে রেডক্রশ বাহিনীর ওপরও বোমা নিক্ষেপ করে। এগুলি যেন চলতি রীতি। ভারতে যেমন হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায়, মুসলমানেরা মসজিদের ভেতর অস্ত্র রাখে। তোমাদের এটা জানা। কাজেই যুদ্ধের ক্ষেত্রে অনেক আন্তর্জাতিক আইন থাকলেও প্রয়োজনের সময় এসব অগ্রাহ্য করা হয় এবং অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করা হয়।
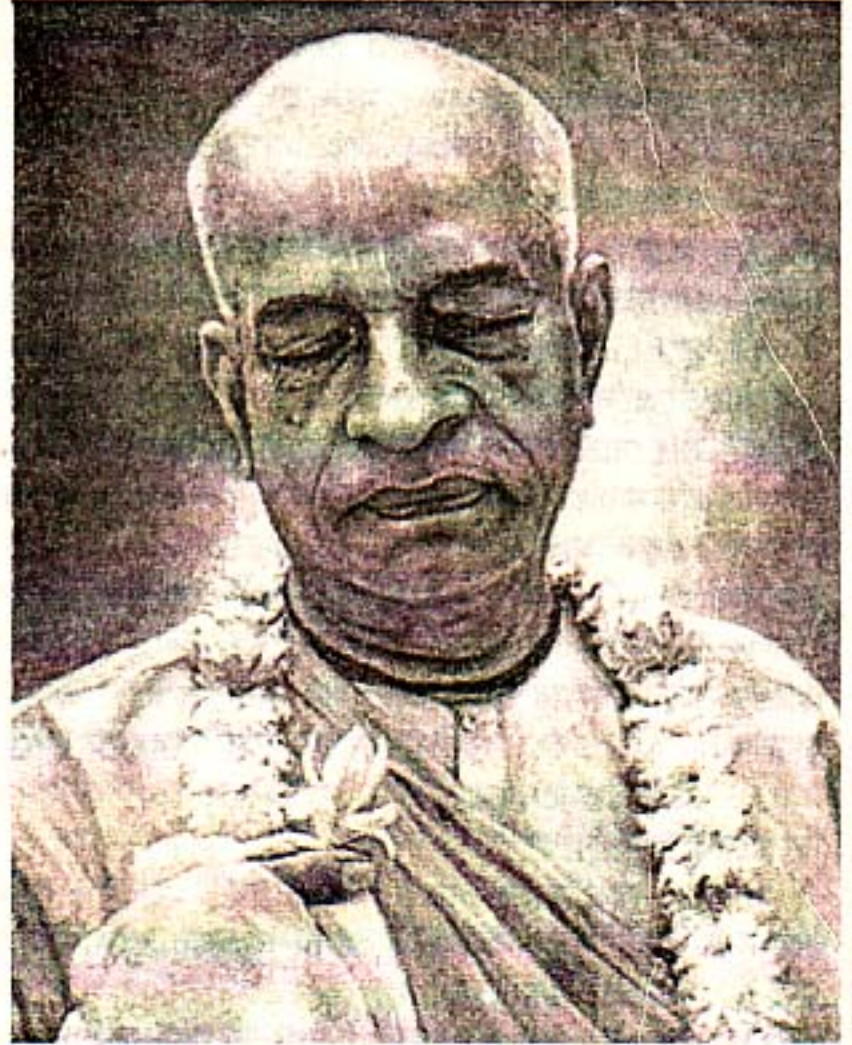
এলাহাবাদে মিঃ ম্যাকফার্সন নামে এক বিশ্বস্ত অফিসারের কাছ থেকে শুনেছি.....সেই সময় আমার একটা ওষুধের দোকান ছিল। মিঃ ফার্সন ছিলেন আমার খদ্দের। যখনই তিনি আমাদের দোকানে আসতেন তখনই তিনি যুদ্ধের অনেক অতীত কাহিনী নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতেন। একবার তিনি বলেছিলেন....সেনাপতিদের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। মার্শাল ফোক প্রথম কি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সেনাপতি ছিলেন। মনে হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ই হবে।

ভক্ত ঃ প্রথম অভিযান।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ মার্শাল ফোক ছিলেন ভারপ্রাপ্ত ফরাসী প্রধান। বেলজিয়াম থেকে অনেক উদ্বাস্তুর আগমন ঘটেছিল, যাদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিল নারী ও শিশু। তারা ফরাসীতে এসেছিল। ভারপ্রাপ্ত অফিসার হলেন মার্শাল ফোক। মিঃ ম্যাকফার্সন আমাকে বলেছিলেন যে "আমরা ছিলাম অফিসার। আমরা জানিয়েছিলাম বেলজিয়াম থেকে অনেক উদ্বাস্তুর আগমন ঘটেছে। কি করতে হবে ?" তখন মার্শাল খুবই রাগ করলেন। তিনি প্রচণ্ড রেগে গেলেন....."আমি কি করতে পারি, এই যুদ্ধক্ষেত্রে ?" তখন তাদের মেরে ফেলার হুকুম হল। সব নারী শিশুদের একত্রে জড় করা হল এবং চারদিক থেকে চারটি বন্দুক দেগে তাদের উড়িয়ে দেওয়া হল। জানলে তো, তাদের নিজেদের..........

সুতরাং যুদ্ধে মাঝে মাঝে এমনটি ঘটে থাকে। যুদ্ধে কোন আন্তর্জাতিক আইন নেই, লোকহিতকর বলে কিছুই নেই.....সবকিছুই চলে। আসল বিষয় হল ইন্দ্রিয় তর্পণের জন্য জড় লাভের জন্য লোকেরা বলে ও কৌশলে যেমন কাজ করবে সবই গ্রাহ্য। তেমনি, কৃষ্ণসেবার জন্য প্রয়োজন হলে সব কিছুই গ্রহণীয়। না হলে শ্রীল সনাতন গোস্বামী কি করে উৎকোচ প্রদান করছেন ? কৃষ্ণ কি করে যুধিষ্ঠির মহারাজকে মিথ্যা ভাষণে উপদেশ দিচ্ছেন ? একটি শ্লোক আছে, **মন নিমিত্তে কৃতং পাপং পূণ্য এব কল্পতে**। মাঝে মাঝে মনে হয় এটা একটা পাপ কাজ। কিন্তু যদি কৃষ্ণের জন্য করা হয়, আমাদের ভক্তি হল **আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্**। কৃষ্ণকে তুষ্ট করতে হবে। "কৃষ্ণ আমাকে মিথ্যা বলতে বলছেন। হ্যাঁ, তবে আমি মিথ্যা বলব।" এটাই 'ভক্তি'। আমি যদি ভাবি, "ওহ্, জীবনে আমি কখনও মিথ্যা বলিনি। এখন কি করে আমি মিথ্যা বলি ?" এটা ভক্তি নয়। কারণ, এটা হল প্রতিকুল। কৃষ্ণের ইচ্ছা-বিরুদ্ধ। সাধারণ লোক এটা বুঝতে পারে না। তারা আতঙ্কিত হবে। তারা ভাবে, "হায়, হায়, এমন সুন্দর ধার্মিক ব্যক্তি যুধিষ্ঠিরকে কৃষ্ণ মিথ্যা কথা বলতে শেখাচ্ছেন।" **অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্**। কেউ যদি কখনও এমনটি ভাবে, তবে সে মূঢ় প্রতিপন্ন হবে। কর্ণ যখন তার রথের চাকা সারাচ্ছিলেন, তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বললেন, "এক্ষুণি ওকে বধ কর এক্ষুনি বধ কর।" কর্ণ তখন প্রতিবাদ করেছিলেন ঃ "অর্জুন, তুমি করছ কি ? আমি এখন যুদ্ধ করছি না।" কিন্তু কৃষ্ণ বললেন, "না, এটাই হল কর্ণকে বধ করার উপযুক্ত সময়। না হলে তুমি তাকে মারতে পারবে না।" কারণ প্রকৃতপক্ষে কর্ণ ছিলেন অর্জুনের থেকে বড় বীর। দোণাচার্য, ভীষ্ম...পরীক্ষিৎ মহারাজ ব্যাখ্যা করেছেন, "কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্র একটি মহাসমুদ্রের মতো, আর সেখানে দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, কর্ণের মতো বড় বড় কুমির রূপী জলজন্তু ছিল। কিন্তু কৃষ্ণের কৃপায় আমার পিতামহ অর্জুন তাঁদের সকলকে সংহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।" ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য বা কর্ণকে বধ করার মতো বলশালী অর্জুন ছিলেন না। তাঁরা সকলেই ছিলেন বড় বড় বীর। এইসব ব্যাপার সেখানে আছে।

আরও অনেক উদাহরণ আছে। যেমন গোপীরা। নিশুতি রাতে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শুনলেই তারা পিতা, ভ্রাতা সন্তান-সন্ততি, সব কিছু ফেলে রেখে ছুটে যেত। আমাদের বৈদিক প্রথানুসারে সোমত্ত মেয়ে, যুবতী নারী তাদের পিতা-ভ্রাতা ও গুরুজনদের সুরক্ষিত আশ্রয় ত্যাগ করে যদি বনে অন্য ছেলের কাছে ছুটে যায়-ওহ্, এটা খুবই পাপ কাজ। সামাজিকভাবে এটা পাপপূর্ণ কাজ। কৃষ্ণ তাদের নির্দেশ দিচ্ছেন, "কি করেছ তোমরা ? এক্ষুণি ঘরে ফিরে যাও।" তখন তারা কাঁদতে শুরু করে। এই বর্ণনাও এখানে আছে। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটা পাপ। গোপীরা যে কৃষ্ণের কাছে গিয়েছিল সেটাও পাপ। তেমনি, প্রহ্লাদ মহারাজের পিতাকে যখন বধ করা হয়, তখন প্রহ্লাদ বিনা প্রতিবাদে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কোন সুস্থব্যক্তি কি বিনা প্রতিবাদে নীরবে দাঁড়িয়ে তার পিতার মৃত্যু-দৃশ্য দেখতে পারবে ? বলি মহারাজ তাঁর গুরুকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। শুক্রাচার্য যখন বললেন যে "প্রতিজ্ঞা করো না। ইনি হলেন বিষ্ণু। তিনি তোমার সব কিছুই কেড়ে নেবেন। কিছুমাত্র শপথ করবে না।" বলি মহারাজ বললেন, "তিনি বিষ্ণু, আর আপনি আমাকে তাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা করতে নিষেধ করছেন ? ওহ্, এমন গুরু আমি চাই না। আমি প্রত্যাখ্যান করি।" পারমার্থিক গুরুকে প্রত্যাখ্যান করা মহাপাপ। সামাজিক এবং ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলি অধর্ম, পাপপূর্ণ কাজ। কারও, গুরুদেবকে প্রত্যাখ্যান, চোখের সামনে নিজ পিতার হত্যালীলা দর্শন, নিশুতি রাতে কোন নারীর পর-পুরুষ অভিসার-এগুলি সব পাপকর্ম, যথেষ্ট পরিমাণে পাপকাজ। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সুপারিশ করছেন, **রম্যা কাচিদ্ উপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা**। ব্রজগোপীদের দ্বারা যে কৃষ্ণ উপাসনা, সেই উপাসনাই সর্বশ্রেষ্ঠ।

এখন মূল কথা হল মাঝে মাঝে এটাকে সামাজিক ও ধর্মীয় নিয়ম-কানুন বিরুদ্ধ বলে মনে হতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্য কৃত হলে...ভক্তি অর্থ **আনুকুল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্**। কৃষ্ণকে তুষ্ট করতে হবে। অন্য কোন ব্যাপার নেই। শুধু কৃষ্ণ-তুষ্টি। যেমন কৃষ্ণ একবার অসুস্থ বলে ভান করলেন। চিকিৎসক ডাকার কথা বলা হল। কিন্তু কৃষ্ণ বললেন, "কোন চিকিৎসক আমাকে সুস্থ করতে পারবে না। যদি কোন ভক্ত তার পদরজ আমার শিরে লেপন করে দিতে পারে তবে আমার শিরঃপীড়া দূর হবে।" তখন সকল ভক্তদের বলা হল, কিন্তু কেউ সম্মত হল না।

"ওহো! কি করে আমি তা দিতে পারি ? আমার পদধুলি কৃষ্ণের শিরে ! কি করে তা সম্ভব ?" এ কাজে কেউ রাজী হল না। তখন কৃষ্ণ বললেন, "বৃন্দাবন যাও। গোপীদের জিজ্ঞাসা কর তারা কেউ দিতে পারে কিনা। তারা আমার শ্রেষ্ঠ সখী। তারা কেউ দিতে প্রস্তুত কিনা? ওহ্-আমি শিরঃপীড়ায় খুব কষ্ট পাচ্ছি।" তাতেও কেউ যেতে সম্মত হল না। কিন্তু গোপীদের কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তারা ছুটে এল ঃ "ইস্ কৃষ্ণ অসুস্থ ! ভক্তের পদরজ দরকার ? এক্ষুণি দিচ্ছি। দয়া করে গ্রহণ করুন, গ্রহণ করুন।" তারা বিন্দুমাত্র চিন্তা করল না যে, "আমাদের পদরজ কৃষ্ণের মাথায় লেপন করে আমরা নরকগামী হব। কোন চিন্তা নেই ; আমরা নরকেই যাব। কৃষ্ণ তুষ্ট হবেন। সেটাই যথেষ্ট। কৃষ্ণ আরোগ্য লাভ করবেন।" এই হল গোপী। গোটা দুনিয়া নরকগামী হলেও কোন কথা নেই। শুধুমাত্র কৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্য ভক্ত সেটা করতে প্রস্তুত ; এটাকেই উত্তম ভক্তি বলে। **আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।** ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে এটা পাওয়া যাবে ঃ **অন্যাভিলাষিতা-শূন্যম্**। কৃষ্ণের সঙ্গে কোন ব্যবসায়িক সম্পর্ক নয় ঃ "আমি কৃষ্ণের ভক্ত হতে পারি বিনিময়ে আমার সব কিছু যেন ঠিকঠাক থাকে। আমি পাপী হব না। আমি এটা করব না, ওটা করব না। আমার পরিবার যেন ভাল থাকে।" এই সব নানান শর্ত আরোপ করা হয়। যেমন অনেকে বৃন্দাবনে যায়-সব পয়সা কড়ি বন্টন করা হয়। "অনেক লোক আছে, তাদের নাতি-ছেলেরা সবাই ঠিক আছে। শর্ত হল "প্রতি মাসে তুমি আমাকে দুশো করে টাকা পাঠাবে। আর যে দু'কোটি টাকা আছে, সেটা তোমার জন্য থাকল। সেটা কৃষ্ণের জন্য নয়। শুধু আমার খোরাক বাবদ মাসে দুশো করে টাকা পাঠাবে।" বৃন্দাবনে এমন অনেক আছে। তেমনি কৃষ্ণও আছেন, কিন্তু তিনি বঞ্চিত। অনেক পরিশ্রম করে আপনি দু'কোটি টাকা রোজগার করেছেন। আপনার সন্তান-সন্ততিদের জন্য সেই টাকা সঞ্চিত আছে। আপনি এখানে শূন্য হাতে এসেছেন। আপনার খোরাকির জন্য মাসে দুশো টাকা বরাদ্দ।" সুতরাং **যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্**. প্রথম কথা হল, কৃষ্ণের উদ্দেশ্যেই সব কিছু অর্পণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। কোন ব্যাপার নেই-আমার ভাগ্য, আমার অর্থ, আমার মান-সম্মান সব সমর্পন করতে হবে। কৃষ্ণ অবশ্যই তুষ্ট হবেন। ঠিক যেমনটি অর্জুন করেছিলেন : অর্জুন যুদ্ধ করতে চাননি। অন্য পক্ষে তার ভ্রাতা, প্রপিতামহ আছেন, তাঁদের তিনি বধ করতে চাননি। কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, "না, কৃষ্ণই এটা চাচ্ছেন, তখন রাজী হলেন। **করিষ্যে বচনং তব।**" এই হল কৃষ্ণভাবনামৃত। অন্য কিছু সম্বন্ধে ভাবতে হবে না। শুধু কৃষ্ণের সন্তোষ। কৃষ্ণ বা তাঁর প্রতিনিধিকে সন্তুষ্ট করা। দু'টো এক জিনিষ। সেটাই ভক্তি। **অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞান কর্মাদ্যনাবৃতম্**। প্রকৃতজ্ঞান-জ্ঞানের বিকৃতি নয়। "ওহো, আমি মিথ্যা বলছি। আমি নরকগামী হব। আমি আমার প্রপিতামহকে বধ করতে যাচ্ছি। আমি নরকে যাব।" একে বলে জ্ঞান। কিন্তু সংজ্ঞা হল, **জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্**। এতে জ্ঞান ও কর্মের স্পর্শ থাকবে না। অস্পর্শিত।

কাজেই এটাই হল বিশুদ্ধ ভক্তি। **অন্যাভিলাষিতা শূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্**......

গোপীরা জ্ঞানী নয়, তারা সাধারণ গ্রাম্য বালা। কি জ্ঞান তাদের থাকবে ? কোন জ্ঞান নেই, কর্ম নেই। কর্ম কি, ত্যাগ কি-তারা জানে না। কাজেই সবকিছু ত্যাগের জন্য জ্ঞান, কর্ম ও যোগের চিন্তা না করে আমাদের তৈরী থাকতে হবে। কৃষ্ণের সন্তুষ্টিই আমাদের বিবেচ্য। **স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধি-হরিতোষণম্।** সেই হল পরিপূর্ণাঙ্গতা। **সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্** ঃ কৃষ্ণের সন্তোষবিধান হল কিনা দেখতে হবে। লোকেদের কৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন তথ্য জানা নেই এবং কিভাবে কৃষ্ণকে তুষ্ট করতে হয় তাও তাদের অজানা। ভক্তির দ্বারা বোঝায় যে, ভক্ত কৃষ্ণের প্রীতির জন্য সবকিছুই ত্যাগ করতে সদা প্রস্তুত। কিন্তু কৃষ্ণ সম্বন্ধে যদি কারও কোন ধারনা না থাকে তবে কোথায় ভক্তি ? নির্বিশেষবাদীদের ভক্তি থাকতে পারে না, কারণ, কৃষ্ণ সম্বন্ধে তাদের কোন তথ্য জানা নেই। কৃষ্ণ কি-তা তারা জানে না। ভক্তির অর্থ হল কৃষ্ণের তুষ্টি। আমি যদি কোন ব্যক্তিকে জানি, তার স্বভাব কেমন জানি, তবে কি করে তাকে তুষ্ট করতে হয় তাও জানতে পারব। আর যদি কারও সম্বন্ধে আপনার কিছুই জানা না থাকে তবে তাকে তুষ্ট করার কোন প্রশ্নই নেই।

প্রদ্যুম্ন ঃ "ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব বিশেষ করে শ্রীল রূপ গোস্বামীকে কৃষ্ণভাবনামৃত বিজ্ঞানের ওপর নির্দেশ দিয়েছিলেন......"

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এখানে মূল বিষয় হল যে, শ্রীল সনাতন গোস্বামী, যিনি দবির খাস নামে পরিচিত, শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভুর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য এত উন্মাদ হয়েছিলেন যে, গ্রাম্য মহাজনের কাছে তাঁর যত টাকা গচ্ছিত ছিল সব টাকা, উৎকোচ দান পাপ জেনেও, কারাধ্যক্ষকে উৎকোচ দান করতে বিন্দুমাত্র চিন্তা করেননি। মন্ত্রীত্বের পদে তিনি ইস্তফা দিয়েছিলেন। নবাব তাই তাঁকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। কারাগার থেকে মুক্ত হবার জন্যই তিনি উৎকোচ দিয়েছিলেন। তিনি পরম উৎফুল্ল হয়েছিলেন। একে বলে-লৌল্যম। লৌল্যমের অর্থ মহালোভী-আমরা যেমন কোন কাজে সফল হলে বা কখনও কিছু লাভ করলে খুবই খুশি হই। আমরা পাগল হয়ে যাই। এমনটিরই দরকার। **লৌল্যম্ এক মূল্যম্**। কৃষ্ণভাবনামৃত পূর্ণরূপে অর্জন করতে হলে এই প্রবল উন্মাদনা বা লোভ থাকতে হবে। ভগবানের সেবায় সাফল্য অর্জনের একমাত্র মূল্য হল কৃষ্ণসেবা। কোন টাকা পয়সা বা অন্য কিছু নয়। কোন খ্যাতি নয়, ভাল বংশ পরিচয় নয়, সৌন্দর্য নয়, কিছুই নয়। শুধু এই, পরমানন্দদায়ক, প্রগাঢ় আকাঙ্খা, "কেমন করে আমি কৃষ্ণকে পাব ? তবেই তোমার কৃষ্ণ প্রাপ্তি হবে। তিনি তোমাকে গ্রহণ করবেন। গোপীদের মধ্যেও তাই, প্রগাঢ় বাসনা। **তত্র লৌল্যমেকমূল্যম্**। এখন জন্মকোটি, ন **লভ্যতে জন্ম-কোটিভিঃ সুকৃতিনঃ**। এই পরমানন্দদায়ক প্রগাঢ় আকাঙ্খা যে, "এই জীবনে আমি সেই কৃষ্ণের স্বীকৃতি পাব যে কৃষ্ণের জন্য আমি সর্বস্ব ত্যাগ করেছি," এটাই কাম্য।

প্রদ্যুন্ন ঃ শ্রীল রূপ গোস্বামীর প্রতি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই শিক্ষাবলী আমাদের 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে, শ্রীল রূপ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাকে বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্য থেকে পাণ্ডিত্য পূর্ণ প্রসঙ্গ এবং প্রতিষ্ঠিত শাস্ত্রগ্রন্থের প্রগাঢ় জ্ঞানের দ্বারা বিশদ ব্যাখ্যা করেছিলেন। শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য তাঁর ষড়গোস্বামী বন্দনায় উল্লেখ করেছেন যে তাঁরা শুধু সংস্কৃত ভাষাতেই নয়, ফার্সী ও আরবি ভাষাতেও বিদগ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁরা সব গ্রন্থই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠ করেছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ বৃটিশ রাজত্বকালে ইংরেজী ভাষা আবশ্যিক ছিল। মুসলমান শাসনকালেও বড় বড় হিন্দু উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে আরবি ও ফারসী ভাষা শিখতে হত। এই গোস্বামীদ্বয়ও যেহেতু নবাবের মন্ত্রী ছিলেন, তাই তাঁরা আরবি ও ফারসী ভাষায় খুবই উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত ছিলেন।

প্রদ্যুম্ন ঃ "তাঁরা বৈদিক জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য তত্ত্বের ওপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্ম-বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সমস্ত বৈদিক সাহিত্য খুবই পুঙ্খানুপঙ্খভাবে অধ্যয়ন করেছেন। বর্তমান কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শ্রীল রূপ গোস্বামীর পাণ্ডিত্যের ওপর নির্ভরশীল। আমরা তাই সাধারণভাবে রূপাঙ্গ বা শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভুপাদের পদাঙ্ক অনুসারী। এটা শুধু আমাদের পথনির্দেশিকা....."

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ **রূপানুগবরায়** তে। রূপানুগ, রূপ গোস্বামীর অনুগামী। আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করি.....শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর গানে বলেছেন-

রূপ-রঘুনাথপদে হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝব সে যুগলপিরীতি ॥

যুগলপ্রীতি, রাধাকৃষ্ণের দাম্পত্য প্রেম কোন তৃতীয় শ্রেণীর ব্যক্তি দ্বারা উপলব্ধ হবে না। সেটা সম্ভব নয়। যারা শ্রীকৃষ্ণকে সাধারণ মানুষ বলে ভাবে এবং রাধারাণীকে সাধারণ বালিকা বলে ভাবে, তাদের দ্বারা রাধা-কৃষ্ণ প্রেম তত্ত্ব উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। এই গোস্বামীদের রচিত ভক্তিশাস্ত্রের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণকে উপলব্ধি করা যায়। তাই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলছেন, "রূপরঘুনাথপদে হইবে আকুতি। রূপ-রঘুনাথের রচনার মাধ্যমে কখন আমি রাধা-কৃষ্ণের যুগল-প্রীতি বুঝতে চেষ্টা করব ?" রূপরঘুনাথ বলতে বোঝাচ্ছে ষড়গোস্বামীদের শুরু হল রূপ গোস্বামী দিয়ে এবং শেষ হল রঘুনাথকে দিয়ে। দু'জন রঘুনাথ আছেন-একজন হলেন ভট্ট রঘুনাথ এবং অপর জন হলেন দাস রঘুনাথ। অতএব শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর বলছেন, **রূপরঘুনাথপদে হৈবে আকুতি কবে হাম বুঝবো.......।** শ্রীল রূপ গোস্বামীর রচনার মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণ ও তাঁদের প্রেমবিষয়ক ব্যাপারটি বুঝতে হবে। ঠিক যেমন এই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

প্রদ্যুম্ন ঃ "শুধু আমাদের পথনির্দেশের জন্যই শ্রীল রূপ গোস্বামী এই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থটি প্রনয়ন করেছেন। যে সমস্ত লোকেরা কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে নিযুক্ত রয়েছেন তাঁরা এই মহান রচনাটি থেকে সুবিধা পেতে পারেন এবং খুব দৃঢ়ভাবে কৃষ্ণভাবনামৃতে অবস্থান করতে পারেন। ভক্তি অর্থ ভগবানের সেবা। প্রত্যেক সেবা কার্যেরই কিছু আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য আছে যা কিনা পরিচারককে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যায় এই জড় জগতের প্রত্যেকেই......"

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ কোন আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য না থাকলে কেউ আগ্রহী হয় না। যেমন আমরা এখানে কৃষ্ণ-ভক্তি সম্বন্ধে কথা বলছি, কিন্তু সাধারণ লোকেরা কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রতি খুব বেশি আগ্রহী নয়। কাজেই তারা এখানে আসার কথা ভাবে না। কোন আকর্ষণ, কোন বৈশিষ্ট্য অবশ্যই থাকতে হবে। বিভিন্ন লোকের আবার বিভিন্ন আকর্ষণ আছে। তাই কৃষ্ণ বলছেন,

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিদ্ মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

ভক্তসঙ্গে থেকে কৃষ্ণের প্রতি এই আকর্ষণকে বাড়িয়ে তোলা যায়, **সতাং প্রসঙ্গাৎ**। কৃষ্ণের প্রতি কেউ আকৃষ্ট নয়। গোটা পৃথিবীটা এমন। তাই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের অর্থ হল এই সব লোকদের ভক্তসঙ্গে মিলনের সুযোগ দেওয়া এবং এইভাবে কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট করা। এটারই দরকার। **ময্যাসক্ত মনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জ মদাশ্রয়**। ময্যাসক্ত, কৃষ্ণ কর্তৃক আকৃষ্ট। কৃষ্ণ অর্থে আকর্ষণীয়, মনোহর। চুম্বকের মতো আকর্ষক, স্বাভাবিকভাবে লোহাকে আকর্ষণ করে। কিন্তু জড় ধরা লোহাকে আকর্ষণ করতে পারে না। তেমনি কৃষ্ণ হলেন আকর্ষক আর আমরা হলাম কৃষ্ণের অংশ বিশেষ। আমরা

তাই কৃষ্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হই। কিন্তু যেহেতু আমরা মায়ারূপ মরিচা দ্বারা আবৃত, তাই আমরা আকৃষ্ট হই না। এই মায়া-মরিচা ঘর্ষণ করে তুলে দিলেই আমরা আকৃষ্ট হব। কৃষ্ণ মানেই আকর্ষক।

প্রদ্যুম্ন ঃ "এই জগতের প্রত্যেকেই কোন না কোন সেবা কার্যে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত, এবং এর থেকে প্রাপ্ত আনন্দই হল এরূপ সেবাকার্যের প্রেরণা।"

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, আনন্দ না পেলে আমরা কাজ করতে পারি না। যেমন, আহমেদাবাদে এক নাট্যানুষ্ঠানে দেখা গিয়েছিল-এক ব্যক্তি পশুহত্যা করছে, এবং সে সেই হত্যালীলাতেই আকৃষ্ট হয়ে আছে। তার আর অন্য কোন দিকে খেয়াল নেই। কলকাতায় যখন এক হোটেলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন দেখেছিলাম এক ব্যক্তি এক মুরগীর গলা কাটছে এবং মুরগীছানাটি গলা কাটা অবস্থায় এদিক-সেদিক লাফাচ্ছে। তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ ব্যাপারটা। লোকটি কিন্তু হাসছিল, কারণ সে এই দৃশ্য দেখে আনন্দ পাচ্ছিল। আমার কাছে এটা ছিল খুবই ভয়ঙ্কর, কিন্তু ওই কসাইটি ঘটনাটি থেকে খুব সুখকর আনন্দ লাভ করছিল ঃ "এই অর্ধছিন্ন মুরগী-শাবকটি লাফাচ্ছে।" আর তার ছেলেটি কাঁদছে। সে সুধাল, "তুই কাঁদছিস কেন ? কি জন্য কাঁদছিস ?" বিভিন্ন দৃষ্টিকোণের বিভিন্ন গুণগত মানের প্রশ্ন এটা। কেউ আকর্ষিত হয়, আবার কেউবা বিকর্ষিত হয়।

প্রদ্যুম্ন ঃ "স্ত্রী-পুত্রের প্রতি স্নেহবশত সংসারী লোক রাত-দিন কাজ করে। একজন লোকহিতৈষী ব্যক্তি একইভাবে তার বিরাট পরিবারের প্রতি ভালবাসাবশত কাজ করে এবং একজন স্বদেশপ্রেমিক তাঁর দেশ ও দেশীবাসীদের জন্য কাজ করে। যে শক্তি একজন জনদরদী গৃহী ও স্বদেশপ্রেমিককে চালিত করে, তাকে রস বা এক প্রকার......"

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ এই আকর্ষণকে বলে রস, রসাল, স্বাদ।

প্রদ্যুম্ন ঃ "......অথবা এক প্রকার রস, বা সম্পর্ক যার স্বাদ খুব মিষ্ট। ভক্তি-রস হল এমন এক প্রকার রস, যা কিনা সাধারণ রস থেকে পৃথক এবং জড়-জাগতিক কর্মীদের দ্বারা উপভুক্ত নয়। জাগতিক কর্মীরা ইন্দ্রিয় তৃপ্তিরূপ বিশেষ এক রকম রসাস্বাদনের জন্য দিনরাত পরিশ্রম করে। জাগতিক রসের স্বাদ দীর্ঘস্থায়ী হয় না, আর সেই জন্যই জাগতিক কর্মীরা সর্বদাই তাদের উপভোগের অবস্থান চটপট পরিবর্তন করে। একজন ব্যবসায়ী সারা সপ্তাহ কাজের মধ্যে তুষ্ট থাকতে চায় না, তাই সে সপ্তাহান্তে অন্য স্থানে গিয়ে তার ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ-কর্ম ভুলতে চেষ্টা করে। তারপর কর্ম বিস্মৃতির মধ্যে কাটিয়ে আবার একদিন সে ব্যবসায়িক কাজকর্মে লেগে পড়ে। জড় কর্মনিযুক্তির অর্থ হল কিছুকাল একটা বিশেষ পদমর্যাদায় বহাল থেকে পরে তার পরিবর্তন করা। এদিক ওদিক পরিবর্তনের অবস্থান প্রায়োগিকভাবে ভোগ-ত্যাগরূপে পরিচিত।"

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ ভোগ-ত্যাগ। ভোগ এবং ত্যাগ।

এই ভোগ-ত্যাগ নিয়ে আমাদের গুরু মহারাজকে প্রশ্ন করেছিলাম। শ্রীল রূপ গোস্বামী সব কিছু ত্যাগ করে, তাঁর লাভজনক চাকরি, মন্ত্রীত্বের পদ সব কিছু ছেড়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি ত্যাগের স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আবার শ্রীরামানন্দ রায় রাজ্য শাসক ও গৃহস্থ ছিলেন। খুবই আড়ম্বরপূর্ণ বিলাসী জীবন যাপন করতেন তিনি। তিনি ছিলেন ভোগের স্তরে। কিন্তু এখন উভয়েই শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্ত। কাজেই পার্থক্য কোথায় ? এই প্রশ্ন গুরু মহারাজকে করা হয়েছিল। তিনি উত্তর দিলেন ঃ ঠিক একজন নারীর মতো। আমাদের বৈদিক প্রথানুসারে প্রচলিত নীতি হলঃ যখন কোন নারীর স্বামী বিদেশে থাকে তখন সে খুব সুন্দর বেশবাসে সজ্জিত হয় না। এরূপ নারীকে প্রোষিতভর্তৃকা বলে। প্রোষিতভর্তৃকার সুন্দর বেশবাস শোভন নয়। বৈদিক প্রথা হল, নারীর সাজ-সজ্জা দেখেই তার অবস্থার কথা জানা যাবে-সে কুমারী, না সধবা বা বিধবা, বা তার স্বামী বিদেশে আছে, অথবা সে কি বারাঙ্গনা-সব, সব কিছুই তার বেশবাসের দ্বারা বোঝা যাবে। তাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে শুধু সাজ-সজ্জার দ্বারাই তার অবস্থার কথা জানা যাবে। প্রোষিতভর্তৃকার ক্ষেত্রেও তাই। সে সাজগোজ করে না, মেঝের ওপর শয়ন করে, সুন্দরভাবে পোশাক পরিবর্তন করে না, কেশবিন্যাস করে না,-এই হল প্রোষিতভর্তৃকার অবস্থা। আবার সেই একই নারী-যখন তার স্বামী তার সঙ্গে স্বদেশে থাকে তখন সে দিনে দু'বার স্নান করে, সুবাসিত তেল ব্যবহার করে, সুন্দর সুন্দর বস্ত্রে দেহতনু সজ্জিত করে। এছাড়া নানা আভরন ও সুগন্ধি দ্রব্যসম্ভারে দেহ অলঙ্কৃত করে। অঙ্গ সজ্জার নানা কলা-কৌশল নারীদের আজন্ম করায়ত্ত। কিন্তু তার এই সুন্দর সাজগোজ করা আর না করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। ভোগ ও ত্যাগের মতো ব্যাপারটি। এই উভয় অবস্থার কেন্দ্রে কিন্তু সেই স্বামী। সুতরাং ভোগ-ত্যাগ কোন বিবেচ্য নয়। কৃষ্ণের জন্য আমাকে সব কিছু ত্যাগ করতে হবে এবং কৃষ্ণের জন্যই সব কিছু গ্রহণ করতে হবে। ভোগ-ত্যাগের ব্যাপার নয়, সেবা-সেবাই আসল। সব কিছু ত্যাগ করে যদি ভালভাবে কৃষ্ণের সেবা করা যায় তবেই আমার সব কিছু ত্যাগ করা হবে এবং যদি সব কিছু গ্রহণ করে ভালভাবে কৃষ্ণের সেবা করি, তবে সব কিছুই গ্রহণ করা হবে। এটারই প্রয়োজন। আনুকূল্যেন।

আমাদের দেখতে হবে কৃষ্ণ এটা চান কিনা। কৃষ্ণ চাচ্ছেন অর্জুন যেন এই যুদ্ধে জয়ী হন এবং শত্রুপক্ষের সকলকে বধ করেন। "হ্যাঁ, আমি তাই করব।" করিষ্যে বচনং তব। কৃষ্ণ যদি অর্জুনকে বলতেন, "কেন এই যুদ্ধ ? এই যুদ্ধ ত্যাগ কর। আমার সঙ্গে বনে চল।" অর্জুন সম্ভবত তাই করতেন। কাজেই আমাদের নীতি ভোগ-ত্যাগ নয়। কৃষ্ণের তুষ্টি হল আমাদের নীতি। সেটাই বিশুদ্ধ ভক্তি।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তম ॥
সর্বোপাধিবিনির্মুক্তং তৎ-পরত্বেন নির্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥

হরে কৃষ্ণ। ●

শ্রীরামানুজ স্বামীর উপদেশ

–সচ্চিদানন্দ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

('প্রপন্নামৃতম্'-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ)

প্রভু রঙ্গনাথের আজ্ঞা লাভ করে যতীশ্বর শ্রীরামানুজ শ্রীবৈষ্ণবসমাবৃত হয়ে স্বীয় মঠে প্রবেশ করলেন ॥ ১ ॥

অন্যান্যস্থানে যে-সমস্ত বৈষ্ণব ছিলেন তাঁদেরকে আহ্বান করে কৃপাপূর্বক প্রসন্ন হয়ে সমস্তশাস্ত্রের ৭২টি সারবাক্য করুণার্ণব মহাযশস্বী জগদ্গুরু যতীরাজ তত্ত্বদানরূপ মহদ্দান বিচারে স্বীয় শিষ্য শ্রীবৈষ্ণবদেরকে বললেন ॥ ২-৩॥

স্বীয় গুরুদেবের ও বৈষ্ণবের কৈঙ্কর্য্যে সমান সম্মান করত তাঁদের সর্বদা সেবা করবে। পূর্ব্বাচার্য্যদের বাক্যে বিশ্বাস করবে ॥ ৪ ॥

ইন্দ্রিয়কিঙ্কর হয়ে দিবানিশি যাপন করবে না। পরমার্থ শাস্ত্র ব্যতীত ইতর-শাস্ত্রসকল সামান্যশাস্ত্র। তাতে কখন নিরত হয়ে থাকবে না ॥ ৫ ॥

প্রথমে আচার্যের কৃপায় ভগবজজ্ঞান লাভ করত ভগবদ্ভক্তি শাস্ত্রে সর্বদা নিরত থাকবে ॥ ৬ ॥

শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ, রস রূপাদি পার্থিব-বিষয়ের কিঙ্কর হবে না। অর্থাৎ ঐ বিষয়সকলকে তৎতৎকার্য্যসময়ে মাত্র গ্রহণপূর্বক সেই সকলকে সমান দেখবে। বিষয়বিশেষে আসক্ত হবে না ॥ ৭ ॥

পুষ্প, চন্দন, তাম্বুল প্রভৃতি সুগন্ধদ্রব্যে কামপ্রবৃত্ত রুচি-কার্য্য কখনই করবে না। অর্থাৎ ভক্তিপ্রবৃত্ত রুচিকার্য্য কেবল ভগবন্নির্ম্মাল্যরূপ তত্তৎ দ্রব্যে করবে ॥ ৮ ॥

ভগবন্নাম-কীর্তনে তোমাদের যে প্রীতি ছিল, সেই প্রীতি এখন ত্বদীয় ভক্তগণের নাম-সংকীর্তনে হউক ॥ ৯ ॥

মহাভাগবতাশ্রয় ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র কারণ-ইহা জেনে দৃঢ়রূপে তাঁদের আজ্ঞানুবর্তী হবে ॥ ১০ ॥

প্রাজ্ঞপুরুষ বিষয়াসক্তি ক্রমে যেরূপ বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ বিষ্ণু-কৈঙ্কর্য্য ও বৈষ্ণব-কৈঙ্কর্য্য পরিত্যাগ করলে মনুষ্য মাত্র বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ১১ ॥

বৈষ্ণবসেবায় উপায়বুদ্ধি পরিত্যাগ করে বুদ্ধিমান ব্যক্তি উপেয়বুদ্ধি সর্বদা করবে। বৈষ্ণবসেবা করে অন্য কোন ফল পাওয়া যায়-এরূপ বুদ্ধিকে উপায়বুদ্ধি বলে। অন্য বহু সুকৃতি ফলে বৈষ্ণবসেবা কৃত হয়-এই বুদ্ধিকেই উপেয়বুদ্ধি বলে ॥ ১২ ॥

মহাভাগবতদিগকে আহ্বান করতে হলে অসম্মানসূচক একবচন ব্যবহার করবে না। সম্মানসূচক বহুবচন ব্যবহার করবে বৈষ্ণবদৃষ্টি করা মাত্র কৃতাঞ্জলী হবে ॥ ১৩ ॥

ভগবান বিষ্ণুর বা বিশুদ্ধ-বৈষ্ণবদের নিকটে পদবিস্তার করে বসবে না ॥ ১৪ ॥

গুরুদেব, বৈষ্ণব ও ভগবানের গৃহের দিকে পাদপ্রসারণপূর্বক কখনও নিদ্রা যাবে না ॥ ১৫ ॥

নিদ্রাভঙ্গে উঠে গুরুপরম্পরা প্রথানুসারে ভগবৎ-ভাগবত নাম উচ্চারণ করবে। ভগবন্নিকটে মহাভাগবত দর্শন করে ঐরূপ আচরণ করবে ॥ ১৬ ॥

গুরুপ্রাপ্ত মন্ত্ররাজকে ধ্যানপূর্বক ভূমিতে দণ্ডবৎ প্রণাম করবে। ভগবানের বা ভগবদ্ভক্তের সংকীর্তন করবে ॥ ১৭ ॥

শ্রীবৈষ্ণবসকল যখন কীর্তন করছেন তাহা সমাপ্ত হবার পূর্বেই তাঁদেরকে সম্যক্ পূজা না করে মধ্যে চলে গেলে বিশেষ অপরাধ হয় ॥ ১৮ ॥

বৈষ্ণব আসছেন শুনলে কিছু দূর গিয়ে অভ্যর্থনা করবে, আর বৈষ্ণব যখন চলে যান তাঁহার সহিত কিছু দূর পর্য্যন্ত অনুগমন করবে ॥ ১৯ ॥

পূর্বোক্ত দু'টি অনুষ্ঠান না করলে মহাদোষ হয়। স্বীয় জীবন যাত্রা বৈষ্ণবের দাসত্বের সহিত ঐক্য করে সর্বদা পূজা করতে হয় ॥ ২০ ॥

বিনয়াদি গুণ দ্বারা এবং ভক্তি দ্বারা মহাত্মা বৈষ্ণবদের অনুসরণ না করে প্রাকৃত ব্যক্তিদের গৃহে গৃহে সর্বদা দেহ-যাত্রার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ গমন করত আপনার নামের পূর্বে তাদের নাম স্বীয় নিয়মাদি পরিত্যাগ-পূর্বক আদরে উচ্চারণ করলে বৈষ্ণবের স্বরূপের হানি হয় ॥ ২১-২৩ ॥

ভগবানের দিব্য বিমান ও গোপুর-সকল দৃষ্টি মাত্রেই অঞ্জলি ধারণ করবে। অন্য দেবতাদের মন্দির দেখে কোন প্রকারে বিস্মিত হবে না ॥ ২৪ ॥

অন্য দেবতার কীর্তন শুনে বিস্ময়াপন্ন হবে না। বিষ্ণু বা বৈষ্ণবদিগের নাম সঙ্কীর্তনকারী ভক্তপুরুষ দেখে আনন্দ লাভ না করাই তাদের মধ্যে একটি অপচার বা অপরাধ বলে জানবে ॥ ২৫-২৬ ॥

শ্রীবৈষ্ণবদের দেহছায়া লঙ্ঘন করবে না। স্বীয় দেহের ছায়া অন্য বৈষ্ণব কর্ত্তৃক স্পর্শ করাবে না ॥ ২৭ ॥

বৈষ্ণবদের পঞ্চসংস্কার অপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরকে স্পর্শ করে বৈষ্ণবদেরকে স্পর্শ করবে। পূর্ববন্দনকারী দরিদ্রবৈষ্ণবকে অনাদর করলে পাতক হয় ॥ ২৮ ॥

বৈষ্ণব যদি 'আমি দাস' বলে পূর্বের প্রণাম করেন তাঁকে অনাদর করলে মহাপরাধ হয় ॥ ২৯ ॥

বৈষ্ণবদের জন্ম, নিদ্রা, আলস্য, অপ্রকাশ্য। সেই সকল দেখে কাহাকেও কিছু বলবে না। তাদের দোষ শীঘ্র পরিত্যাগ করে গুণসকল কীর্তন করবে ॥ ৩০-৩১ ॥

বিষ্ণুপাদোদক ও বৈষ্ণব-পাদোদক রূপ উত্তম জল প্রাকৃত লোকের দর্শন পথে থেকে পান করবে না ॥ ৩২ ॥

তত্ত্বত্রয়-জ্ঞানহীন ও শ্রীরহস্যত্রয়-জ্ঞানরহিত ব্যক্তির পাদোদক কদাপি গ্রহণ করিবে না। চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তত্ত্বত্রয়। ভগবান এক অদ্বয়তত্ত্ব এবং সেই অদ্বয়বস্তুর দুইটি বিশেষ অর্থাৎ চিৎ ও অচিৎ, এইরূপ জ্ঞানরহিত লোক পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত হলেও তাদের পাদোদক গ্রহণ

করবে না ॥ ৩৩ ॥

জ্ঞানানুষ্ঠানযুক্ত অর্থাৎ অর্থপঞ্চকজ্ঞান ও তত্ত্বত্রয়-জ্ঞানযুক্ত (৫১ শ্লোক) ও সদাচাররত বৈষ্ণবের পাদোদক যত্নপূর্বক নিত্য পান করবে ॥ ৩৪ ॥

আপনাকে বৈষ্ণবদের সহিত সমান জ্ঞান করবে না। প্রাকৃতলোকের দৈবাৎ সংস্পর্শমাত্র বস্ত্রের সহিত স্নাত হয়ে সহসা বৈষ্ণবচরণামৃত পান করবে ॥ ৩৫ ॥

বৈরাগ্য-জ্ঞান-ভক্ত্যাদি গুণসম্পন্ন মহাত্মা বৈষ্ণবদিগকে মহাভাগ চরমবিগ্রহ বলে জানবে। সেই মহাত্মাদেরকে বিশেষরূপে বিশ্বাস করবে ॥ ৩৬ ॥

বৈরাগ্যজ্ঞান-ভক্ত্যাদি গুণবান যে মহাত্মা ভাগবতসকল আছেন, তাঁদের প্রতি প্রীতি অভ্যাস করবে ॥ ৩৭ ॥

প্রাকৃতলোকের গৃহস্থিত শালগ্রামশিলার চরণামৃত গ্রহণ করবে না। প্রাকৃত-ব্যক্তিদিগের গৃহস্থিত বিষ্ণুবিগ্রহ সেবা করবে না ॥ ৩৮ ॥

ভগবানের লীলাস্থানসকলের প্রাকৃতলোকের দৃষ্ট হলেও তীর্থপ্রসাদ গ্রহণ করবে, সংশয় করবে না ॥ ৩৯ ॥

বিষ্ণুসন্নিধানে কোন শ্রীবৈষ্ণব যদি প্রসাদ দান করেন, তাহা "আমি উপবাসাদি নিয়মযুক্ত" বলে পরিত্যাগ করবে না ॥ ৪০ ॥

সর্বপাপহর পবিত্র হরিপ্রসাদে কদাচিদপি উচ্ছিষ্ট বুদ্ধি করবে না ॥ ৪১ ॥

বৈষ্ণবদের নিকটে নিজগুণ কীর্তন করবে না এবং অন্য কাহাকেও নিন্দা করবে না ॥ ৪২ ॥

মহাত্মা বৈষ্ণবদের গুণানুভব কৈঙ্কর্য্য সময়ে একক্ষণও অন্য কার্য্য করবে না ॥ ৪৩ ॥

প্রতিদিন এক ঘটিকা গুরুর সদ্‌গুণসকল বিশ্বাসপূর্বক বর্ণন করবে ॥ ৪৪ ॥

শঠকোপাদি আচার্যবিষয়ে প্রবন্ধ অথবা গুরুসম্বন্ধে প্রবন্ধে দিনের মধ্যে এক ঘটিকা অবশ্য কীর্তন করবে ॥ ৪৫ ॥

দেহাভিমানী ব্যক্তির সহিত সহবাস করবে না। বিষয়াতুর বঞ্চকগণ যদি বৈষ্ণবচিহ্নসকল ধারণ করে, তথাপি তাদের সহিত সহবাস করবে না ॥ ৪৬ ॥

অন্য দেবতা-ভক্তগণের সহিত, সঙ্গদোষ নিবৃত্তির জন্য পরদোষ-তৎপর ব্যক্তির সহিত সর্বদা সম্ভাষণ করবে না ॥ ৪৭ ॥

মহাভাগ বৈষ্ণবদের সহিত সর্বদা সল্লাপ করবে। তাঁদের নিন্দুক পুরুষাধমদেরকে দেখবে না ॥ ৪৮ ॥

গুরুর প্রতি অপরাধী ক্রুর ব্যক্তিগণকে দেখবে না। গুরু ও বৈষ্ণবে যাঁরা একনিষ্ঠ এরূপ পুরুষদের সহিত সর্বদা সঙ্গ করবে ॥ ৪৯ ॥

সৎসম্প্রদায়ে প্রয়োজন সিদ্ধির যে উপায় নির্দিষ্ট হয়েছে, তদ্ব্যতীত অন্যোপায়নিষ্ঠ পুরুষদেরকে পরিবর্জ্জন করবে অর্থাৎ তাদের সঙ্গে করবে না ॥ ৫০ ॥

প্রপত্তি-ধর্ম্মনিরত ব্যক্তিগণের সহিত সহবাস করবে। রহস্যত্রয়-সারজ্ঞ এবং তত্ত্বত্রয়-বিশারদ মহাভাগবতগণের সহিত সহবাস করবে ॥ ৫১ ॥

তত্ত্বত্রয় যথা-

ঈশ্বরশ্চিদচিচ্চেতি পদার্থ ত্রিতয়ং হরিঃ।

ঈশ্বরশ্চিত ইত্যুক্তো জীবোদৃশ্যমচিৎ পুনঃ ॥ ৫১ ॥

অর্থকামপর ব্যক্তির সহিত কদাচিৎ বাস করবে না। ভগবৎ-ভক্তিনিষ্ঠ ব্যক্তির সহিত সর্বদা সংলাপ করবে ॥ ৫২ ॥

আপনাদিগকে যদি বৈষ্ণব তিরস্কার করেন, তাহা হলে অপকার স্মরণ না করে মৌন হয়ে বসবে ॥ ৫৩ ॥

বৈষ্ণবের পরমপদে বুদ্ধি সঞ্জাত হয়। শ্রীবৈষ্ণবদের সর্বদা হিতচেষ্টা করবে ॥ ৫৪ ॥

যে কর্ম্ম ধর্ম্ম বহির্ভূত তাহা যদ্যপি মহাফলযুক্ত হয়। মেধাবী ব্যক্তি তাকে হিত বলে সেবা করবে না ॥ ৫৫ ॥

পুষ্প, চন্দন, তাম্বুল, বস্ত্র, উদক, ফলাদি এবং অন্ন যাহা হরিকে অর্পণ করা হয় নাই, তাহা কখনই সেবন করবে না ॥ ৫৬ ॥

হরিকে যাহা অর্পিত হয় নাই এমত কোন বস্তু সাধনান্তর দ্বারা প্রাপ্ত অর্থ-কামাদি-প্রযুক্ত ধারণ করবে না ॥ ৫৭ ॥

ঐ সকল বস্তু অযাচিত প্রাপ্ত হলেও গ্রহণ করবে না। জাত্যাদি বুদ্ধিদ্বারা অদুষ্ট অন্নাদি আদরপূর্বক গ্রহণ করবে ॥ ৫৮ ॥

স্বদেহপ্রিয় ভোগদ্রব্য পরমাত্মাকে অর্পন করবে না। শাস্ত্রীয় সমস্ত ভোগ্যবস্তু বিষ্ণুকে অর্পন করবে ॥ ৫৯ ॥

ভগবদর্পিত সুগন্ধি পানিয়-ভক্ষ্যাদি বস্তুতে ভোগবুদ্ধি পরিত্যাগ করে সর্বদা প্রসাদ বুদ্ধি করবে ॥ ৬০ ॥

শাস্ত্রীয় সমস্ত কর্ম মন্ত্রত্রয়ার্থ-নিষ্ঠ মহাভাগবতের সম্বন্ধে কৈঙ্কর্য্যবুদ্ধিতে করবে ॥ ৬১ ॥

অপচার ব্যতীত আত্মনাশের আর কোন কারণ নাই। তাঁহার সুখোল্লাসন যাতে হয় এরূপ সামান্য অপচার আত্মমোক্ষের হেতুত্ব প্রযুক্ত স্বীকৃত হতে পারে ॥ ৬২ ॥

বিষ্ণুভক্তদিগের পূজা করলে পুরুষার্থ আছে। বৈষ্ণবে দ্বেষ করলে কোন পরমার্থ হয় না, কেবল আত্মার নাশ হয় ॥ ৬৩ ॥

অর্চ্চাবিষ্ণুতে শিলাবুদ্ধি, গুরুতে নরমতি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু বা বৈষ্ণবের কলিমলনাশক চরণামৃতে জলবুদ্ধি, কলিকলুষহারী-সিদ্ধ ভগবন্মন্ত্রে শব্দ-সামান্য বুদ্ধি, সর্বেশ্বর শ্রীপতি রূপ ঈশ্বরে এবং তদিতর দেবগণে যাহার সমানবুদ্ধি, সেই ব্যক্তি নারকী ॥ ৬৪ ॥

বৈষ্ণবদের আরাধন, ভগবানের উত্তম পূজা বিধি, বিষ্ণু অপমান অপেক্ষা বৈষ্ণব উল্লঙ্ঘন গুরুতর, বৈষ্ণব পদজল বিষ্ণু পদজল হতে গুরুতর, তাহা জেনে অতন্ত্রিতরূপে বৈষ্ণবদের সমারাধনে যত্নবান হও ॥ ৬৫ ॥ ●

অনুমাত্রও ভিন্ন দর্শনে মহাভয় জাগবেই

১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রোদয় মন্দিরকক্ষে প্রদত্ত ভাগবত (৩/২৯/২৬) প্রবচন থেকে সংকলিত

-শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ

পরমেশ্বর ভগবান জন্মরহিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা তিনি কপিল মুনিরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সমগ্র মানব জাতির কল্যাণার্থে দিব্যজ্ঞান প্রদান করার জন্যই তিনি অবতীর্ণ হয়েছিলেন। (ভাঃ ৩/২৫/১)

কর্দম মুনি বৈরাগ্য অবলম্বন করে যখন বনে গমন করেছিলেন' তখন তাঁর পুত্ররূপে কপিলমুনি তাঁর মাতা দেবহুতি (কর্দমমুনির পত্নী)-র প্রসন্নতা বিধানের জন্য বিন্দু-সরোবরের তীরে অবস্থান করেন।

পিতার অনুপস্থিতিতে বয়স্ক পুত্রের মায়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করে তাঁর যথাসাধ্য সেবা করা কর্তব্য, যাতে তিনি পতির বিচ্ছেদ অনুভব না করেন, আর বয়স্ক পুত্র তার পত্নী এবং গৃহস্থালির দায়িত্বভার গ্রহণ করতে সক্ষম হওয়া মাত্রই পতির কর্তব্য গৃহত্যাগ করা। এটাই বৈদিক গার্হস্থ্য জীবনের সমাজবিজ্ঞান সম্মত প্রথা। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত-গৃহের ব্যাপারে নিরন্তর যুক্ত থাকা কোনও মানুষের উচিত নয়।

যেহেতু দেবহুতির পতি কর্দমমুনি গৃহত্যাগ করেছিলেন, তাই দেবহুতি তাঁর উপযুক্ত পুত্র কপিলদেবের সৎ উপদেশ শ্রবণ করে দুশ্চিন্তার কবল থেকে ত্রাণ পেতে চেষ্টা করতেন।

কপিল মুনিকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলে স্বীকার করা হয়। চিন্ময় জ্ঞানরূপী সূর্য-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ প্রকাশ হলেন কপিলমুনি (ভাগবত ৩/২৫/৯)। সূর্য যেমন বিশ্বের অন্ধকার দূর করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের আলোক যখন এইভাবে অবতার রূপে নেমে আসে, তখনই মায়ার অন্ধকার দূর হয়ে যায়। আমাদের চোখ রয়েছে, কিন্তু সূর্যের কিরণ না থাকলে আমাদের চোখের কোনই মূল্য নেই। তেমনই, পরমেশ্বর ভগবানের আলোক ছাড়া বা সদ্‌গুরুর কৃপা ছাড়া পারমার্থিক জীবনের কোন বস্তুই আমরা যথাযথভাবে দর্শন করতে পারি না।

দেবহুতির কাছে ভগবদ্ভক্তির ব্যাখ্যা (ভাগবত ৩/২৯ অধ্যায়) প্রসঙ্গে ভগবান কপিলদেব বলেছিলেন, "যে ব্যক্তি নিজের এবং অন্যের মধ্যে অণুমাত্র ভিন্ন দর্শন করে, মৃত্যুর প্রজ্বলিত অগ্নিরূপে আমি তার মহাভয় উৎপন্ন করি।"

(শ্লোক ২৬)

সমস্ত প্রকার জীবের মধ্যে নানা প্রকার দৈহিক পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু ভক্তের পক্ষে সেই পার্থক্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন জীবের মধ্যে ভেদভাব দর্শন করা উচিত নয়, ভক্তের কর্তব্য সর্বপ্রকার জীবের মধ্যে আত্মা এবং পরমাত্মাকে সমানভাবে অবস্থিত দর্শন করা।

অতএব, দান, সম্মান ও মৈত্রীপূর্ণ আচরনের দ্বারা

সমস্ত জীবকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করে, সমস্ত জীবের আত্মার স্বরূপে বিরাজমান ভগবানের পূজা করা উচিত।

ভগবান কপিলদেব তাঁর মাতা দেবহুতিকে তাই পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, যারা ভিন্নদৃশঃ অর্থাৎ ভেদদর্শী, যারা আপন এবং পর এই ভেদ দর্শন করে, তারা মায়াবদ্ধ জীব। যারা মায়ামুক্ত জীব, তাদের জীবন দর্শন ঈশাবাস্যমিদম্ সর্বম্। সব কিছুই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এবং তাঁর সঙ্গেই সব কিছু সম্পর্কিত। তাই তাদের দৃষ্টিতে কোনও ভেদভাব থাকে না।

যেমন, একটি পরিবারের বিভিন্ন সদস্যরা তাদের পরিবারগোষ্ঠীর পক্ষে যেটা ভাল, সকলেই সেই উদ্দেশ্যে কাজকর্ম করে, নিজেদের মধ্যে তারা কেউ কোনও ভেদ দর্শন করে না। সকলেই তারা বোঝে প্রত্যেকেই আপনজন। পরিবারের কেউ অনেক টাকা রোজগার করলে অন্যেরাও আনন্দ লাভ করে। কারণ সকলেরই তাতে ভাগ আছে, প্রত্যেকেরই তা থেকে কিছু না কিছু লাভ হয়।

কিন্তু যারা ভেদ দর্শন করে, তাদের মধ্যে অপর কেউ প্রচুর ধনসম্পত্তি লাভ করলে অন্য জনের মনে হয়- 'ওঃ, ঐ লোকটার এত টাকা, আর আমার কিছু লাভ হল না!' তেমনি আপনজন কষ্ট পেলেও আমরা তো কষ্ট পাই-ভাবি, কেমন করে তাকে নিষ্কৃতি দিতে পারি।

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর প্রাঞ্জল জ্ঞানগর্ভ ভাগবত-ভাষ্যে (৩/২৯/২৬) তাৎপর্য বর্ণনা করে লিখেছেন, সমস্ত প্রকার জীবের মধ্যে নানাবিধ দৈহিক

পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু ভক্তের পক্ষে সেই পার্থক্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন জীবের মধ্যে ভেদভাব দর্শন করা উচিত নয়, ভক্তের কর্তব্য সর্বপ্রকার জীবের মধ্যে আত্মা এবং পরমাত্মাকে সমানভাবে অবস্থিত দর্শন করা।

অর্থাৎ, দৃষ্টি থেকে ভেদভাব দূর হয়ে যাওয়াটাই হচ্ছে চিন্ময়ত্বের লক্ষণ। জড়ত্বের লক্ষণ হল-যত বেশী জড়মুখী হব, ভেদভাব তত বেড়ে যাবে, বিভেদ বিসম্বাদ ততই দেখা দেবে সমাজে।

যেমন, কিছুদিন আগেও ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলিতেও যৌথ পরিবার ছিল-এক একটা পরিবারে ১০০-২০০ জন করে সদস্য মিলেমিশে বিরাট পরিবারগোষ্ঠীর মতো বসবাস করত। তার আগে একটা পুরো গ্রামই একটা পরিবারগোষ্ঠীর মতো থাকত এবং সেই পরিবারের নামেই গ্রামটি পরিচিতি লাভ করত। সেই গ্রামের সকলের সুখ-দুঃখে সকলেরই সহানুভূতি জাগত। কিংবা গোটা দেশটাই রাজাকে কেন্দ্র করে নিজেদের একই পরিবারভুক্ত বলে মনে করত। অবশেষে ভগবানকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বটাই একটি বিশ্বপরিবার হয়ে উঠেছিল পুরাকালে।

অর্থাৎ **বসুধৈব কুটুম্বকম**-এই যে, 'বসুধা' বা বসুন্ধরা অর্থাৎ পৃথিবী এই সারা পৃথিবীটাই একটা কুটুম্ব, একটা পরিবার বলে বৈদিক শাস্ত্রের মাধ্যমে মানুষকে শেখানো হয়েছিল-আজকের দিনে সমাজবিজ্ঞানী তথা আধুনিক রাজনীতিবিদেরা যাকে 'ওয়ান ওয়ার্লড' থিয়োরি নাম দিয়ে যেন নতুন কিছু তত্ত্ব শোনাচ্ছেন বলে মনে করছেন।

এইভাবে দেখা যায়, ভারতীয় সনাতন মানবধর্মে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্' ভাবধারা অনুযায়ী, পৃথিবীর সকলেই একটা বিরাট পরিবারের মতো, আত্মীয় কুটুম্বের মতোই নিবিড় প্রীতিমূলক আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ রয়েছে-সেখানে সকলেই সকলের সাথে ভালবাসার সূত্রে সুসম্পর্কিত।

কেবল মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, পশুপাখি গাছপালা কীটপতঙ্গ সকলেই পরস্পরের সঙ্গে প্রীতির বন্ধনে সম্পর্কিত, এই কথা ভাবতে শেখানো হয়েছে ভারতীয় বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে। ভগবানই এমনভাবে এই পৃথিবীটাকে সৃষ্টি করেছেন। একটু মনোনিবেশ সহকারে ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে ভাবলেই আমরা সেটা দেখতে পাই।

কারণ সকলেই ভগবানের বিভিন্ন অংশ, তাই সেই বিবেচনাতেও আমরা সকলের সঙ্গে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে সম্পর্কিত। আপাতদৃষ্টিতে দেখতে পাই-চলমান পশু পাখি কীটপতঙ্গের কথা ছেড়ে দিলেও-নিশ্চল গাছপালাদের সাথেও আমাদের জীবনধারা কতরকমে সম্পর্কিত হয়ে রয়েছে। যখন আমরা শ্বাস গ্রহণ করছি, তখন অক্সিজেন নিচ্ছি, আবার শ্বাস ছাড়ার সময় কার্বণডাইঅক্সাইড ছাড়ছি-সেটি গাছেরা গ্রহণ করে নিচ্ছে এবং তার বদলে তারা অক্সিজেন ছেড়ে দিচ্ছে। ভগবানই তো গাছপালাগুলিকে এমন বিস্ময়কর কলাকৌশলে তৈরী করে দিয়েছেন।

এইভাবে পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণের সন্তান সন্ততিরূপে, তাঁর অবিচ্ছেদ্য বিভিন্নাংশরূপে সকল জীব চিরকালের মতো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত। কৃষ্ণ-সম্পর্ক না দেখলেও, ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিচারেও গাছপালারা আমাদের কুটুম্ব। এইভাবে সারা পৃথিবী বাস্তবিকই একটা বিরাট পরিবার।

কিন্তু মানুষ যখন পরমেশ্বর ভগবান তথা পরম পিতা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে যায়, তখন তারা এই সম্পর্কের কথাও ভুলে যায়। আর যত বেশি তারা দূরে সরে যায় এই আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বোধ থেকে, ততই আপন ভাবটি হারিয়ে ফেলে।

তাই কলিযুগে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বসুধার কথা ছেড়ে দিলেও, রাজ্য বা গ্রামের কুটুম্বতার কথা ছেড়ে দিলেও, একটা গৃহে সংসারেই একত্রে মানুষ থাকতে পারছে না-ছেলেরা বড় হয়ে বৃদ্ধ মা-বাবাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তাদের কোনই কৃতজ্ঞতা বোধ নেই। মা-বাবা তাদের এত কষ্ট করে বড় করে তুলেছে, সেই কথা ভুলে গিয়ে ভিন্ন হয়ে বসবাস করছে। তারপরে, যে-স্ত্রীকে নিয়ে সুখে ঘর বাঁধবে বলে বৃদ্ধ মা-বাবাকে ছেড়ে চলে এসেছিল, একদিন সেই স্ত্রীও তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে।

ভগবানের প্রতি বিমুখ হলেই এই ধরনের ভিন্ন দর্শন জাগে। ভগবৎ-বিমুখতা মানেই জড় জগতের অস্থায়ী সুখের প্রতি আসক্ত। আমরা যত বেশি জড় সুখান্বেষী হব, ততই ভেদভাব বাড়বে।

তাই শ্রীমদ্ভাগবতে (৩/২৯/২৬) ভগবান কপিলদেবের উপদেশে লিপিবদ্ধ হয়েছে যে, মানুষ যখন নিজের এবং অন্যের মধ্যে অণুমাত্রও ভিন্ন দর্শন করে, তখন মৃত্যুর প্রজ্বলিত অগ্নিরূপে ভগবান তার হৃদয়ে মহাভয় উৎপন্ন করেন।

অর্থাৎ যারা জড় জগতের সুখ আহরণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে, তারা তাদের জড় দেহটাকে স্বরূপ বলে মনে করছে এবং তারা ভুলে যাচ্ছে যে, একটা দিন তাদের ঐ দেহটাকে ছেড়ে চলে যেতেই হবে। যেহেতু তারা ঐ জড় দেহের সুখান্বেষণে অত্যন্ত আসক্ত, তাই তারা মৃত্যুকেও অত্যন্ত ভয় করে।

কিন্তু যাঁরা ভক্ত হয়েছেন, ভগবানের শরণাগত হয়েছেন, ভগবানকে নিত্য স্মরণ না করে কোন কাজই করেন না, তাঁরা ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারেন যে, জড় দেহটি জীবের স্বরূপ নয়। দেহটির নিরন্তর পরিবর্তন হচ্ছে-কৌমার, যৌবন ও জরার শেষে দেহান্তর হবেই হবে। তবু সেই পাঁচ বছরের শিশু আমি এবং আজকের আমি স্বরূপত একই ব্যক্তি। তাই যারা ধীর, তত্ত্বজ্ঞানী, তাঁরা এই ব্যাপারে বিন্দুমাত্র মুহ্যমান হন না। পুরনো কাপড় ফেলে দিয়ে যেমন নতুন কাপড় পরতে হয়-ফেলে দেওয়া মানে মৃত্যু-তেমনি দেহ জীর্ণ হয়ে গেলে সেটি ত্যাগ করতেই হয়।

পুরনো কাপড় ত্যাগ করে নতুন কাপড় পেলে যেমন লোকে আনন্দ উপভোগ করে, তেমনি যাঁদের স্বরূপ জ্ঞান

লাভ হয়েছে, তাঁরা কখনই জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপারে দুঃখিত হন না। যার জন্ম হয়েছে, তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য অনুশোচনার কোনই কারণ নেই। যাঁরা ভগবৎ তত্ত্ববেত্তা, তাঁদের এই জ্ঞানের স্ফুরন ঘটে, তাঁরা তাই মৃত্যুভয়ে যেমন ভীত হন না, তেমনি কাউকে ভিন্ন দর্শনও করেন না।

জড় জগতের অস্থায়ী যশ প্রতিপত্তির লোভে মানুষের মধ্যে ঈর্ষাবোধ জাগ্রত হলে, জড় সুখের আকাঙ্খায় অত্যধিক লালায়িত হলে, ভয় জাগে বুঝি কেউ প্রাপ্তিযোগে বিঘ্ন ঘটাবে। তখন ভিন্ন বোধ জাগে, মহাভয়ে কাতর হয়ে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ বৃথা চেষ্টা করতে থাকে।

অতএব, দান-সম্মান এবং সহনশীল মৈত্রীপূর্ণ আচরণের দ্বারা পৃথিবীর তথা সমাজের সমস্ত জীব, সমস্ত সম্প্রদায়, সমস্ত আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশীকে সম-দৃষ্টিতে দর্শন করার শিক্ষা লাভ করতে হয় এবং সমস্ত জীবের আত্মার স্বরূপে বিরাজমান শ্রীভগবানের পূজা করা উচিত। (ভাঃ ৩/২৯/২৭)

ভগবানের আরধনার মাধ্যমেই এই দর্শন শিক্ষা সহজে লাভ করা যায়। যার এই শিক্ষা লাভ হয়নি, সে মৃত্যুভয়ে সদাসর্বদা ভীত হয়ে থাকে-এই উপদেশ ভাগবতে স্বয়ং ভগবান কপিলদেব অবতাররূপে মানব সমাজকে দিয়ে গেছেন।

যারা এই সৎ উপদেশ লাভ করবার সুযোগ পায়নি, তারাই মৃত্যুকে ভয় পায়, তারা বলে, "মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।" কিন্তু যতই এই ধরনের কবিতায় ভাব বিন্যাস করা হোক, মরতে হবেই-মরতে চাই না বলে ভয় পেলে বুঝতে হবে-ভগবানের উপদেশ তার কানে ঢোকেনি। অথচ বহু জড় সাহিত্যে এই কবিতাংশটি অনেকের বেশ ভাল লাগে' যদিও এই কবি ছত্রটির অন্তর্নিহিত ভাবার্থ কোনও যথার্থ জ্ঞানের পরিচয় মোটেই বহন করে না।

কারণ 'মরিতে চাহিনা' যে বলে, সে মরণকে ভয় পায়, অতএব অবশ্যই সে ভগবৎ-বিমুখ। অবশ্য, অধিকাংশ মানুষই তাই। আর 'সুন্দর ভুবনে' কথাটিও অলীক বর্ণনা। শাস্ত্রমতে বাস্তবিকই এই ভুবনটি হল 'দুঃখালয়ম্ অশাশ্বতম্'। দুঃখময় আলয় এবং অশাশ্বত অর্থাৎ অনিত্য অস্থায়ী এই পৃথিবীকে 'সুন্দর' বলেন যে কবি, তিনি মানুষকে বৃথাই বিভ্রান্ত করেন, তা অবশ্যই বলতে হবে। এই সমস্ত সারতত্ত্ব ভালভাবে বুঝতে হলে উপযুক্ত জ্ঞানীর কাছে গীতা ভাগবতের কথা শুনতে হয় এবং নিত্য ভগবানের নামকীর্তন করতে হয়। এই শিক্ষা আমাদের সমাজে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। নচেৎ হানাহানি ভেদাভেদ পৃথিবীতে কমবে না। সকলের আত্মাকে ব্যষ্টি আত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কজ্ঞানে উপলব্ধি করা উচিত। ভাগবতে (৩/২৯/২৭) ব্যষ্টি আত্মার পূজা করার বিধি বর্ণনা করা হয়েছে সুস্পষ্টভাবে। বলা হয়েছে, **অর্হয়েৎ দানমানাভ্যাস্ মৈত্র্যা অভিন্নেব চক্ষুষা।**

অর্থাৎ দান এবং সম্মান প্রদানের মাধ্যমে সকলের হৃদয়ে বিরাজমান ভগবানকে ভেদভাবরহিত হয়ে এবং মিত্রতামূলক আচরণের মাধ্যমে পূজা তথা শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করা উচিত।

ভাগবতের এই অংশে দুটি সংস্কৃত শব্দ রয়েছে-দান এবং মান। যারা জাগতিক অথবা আর্থিক অবস্থায় আমাদের থেকে নিকৃষ্ট, তাদের দান করতে হয়। মান অর্থাৎ সম্মান উৎকৃষ্টকে দেওয়া উচিত। দান নিকৃষ্টকে দিতে হয়। এইভাবে সমাজের ভেদাভেদ দূর করার জন্য সমতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে সার্থক সুন্দর পদ্ধতিতে।●

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ডলার পরবে, তবে সে জন্য এক্ষুনি ২০০ ডলার পাঠানো হল। সেই নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রেরণের পরেই তুমি আমাকে বিষয়টা জানাবে, যাতে আমি এ লক্ষ্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে পারি।

কীর্তনানন্দ যখন আসছে তখন সোসাইটির কিছু এনভেলাপ ও আমার জন্য কিছু আমসত্ত্ব পাঠাবে। কীর্তনানন্দ জানে এটা কোথায় পাওয়া যায়। আমি রায়রামাকে কিছু নির্দেশ পাঠিয়েছিলাম, আশা করি তুমিও তা জেনেছ।

এখানে সব কিছু সুন্দরভাবে চলছে। চারজন শিষ্য দীক্ষা গ্রহণ করেছে ও দু'জন শিষ্য বিবাহ করেছে। অভূতপূর্ব বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রায় ১৫০ জন উপস্থিত থেকে প্রসাদ গ্রহণ করে। শ্রীমান রনচোর কয়েকজন মেয়েকে সঙ্গে করে কচুরী, সমোসা, ইসকন বল, পুরি, চাটনী ইত্যাদি তৈরী তাছাড়া বিভিন্ন রকম ফল দেওয়া হয়েছিল। ভক্তরা খুব আনন্দের সাথে প্রসাদ পায়। দীক্ষাপ্রাপ্ত শিষ্যরা হচ্ছে শ্রীহরি দাস ব্রহ্মচারী (হারভে কোহেন) শ্রী শ্যামসুন্দর অধিকারী (শ্যাম) শ্রীমতি মালতি দেবী। (মিসেস মেলোডি) শ্রীমতি হর্ষা দেবী (মিস্ হোপ)

সকাল বেলার ক্লাশে নুন্যতপক্ষে ২৫ জন এবং সান্ধ্যকালীন ক্লাসে ৩০ থেকে ৫০ জন ছাত্র যোগদান করে। আমার ধারণা তারা ধীরে ধীরে প্রকৃত দর্শনটা বিশেষভাবে উপলব্ধি করছে। শ্রীমান মুকুন্দ দাস নামে একজন ভক্ত যার এখানে প্রায় ষাট একর জমি রয়েছে, সে সেটি সোসাইটি-কে দান করতে চায় এবং দায়িত্বও নিতে চায়। এটা খুবই আনন্দদায়ক একটি ঘটনা।

তুমি বিস্তারিতভাবে পত্রে উত্তর দিবে ও আমাকে বাড়ী ক্রয়ের ব্যাপারে কি হল জানাবে। আমার ধারণা, আমার অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তুমি খুবই ভালভাবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছ। যদুরাণীর ব্যাপারে যত্ন নিবে, তাঁর অঙ্কন যাতে খুব সুন্দরভাবে চালিয়ে যেতে পারে। সে খুবই দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন। পরবর্তীতে আরো লিখবো। তোমাদের সকলের প্রতি আমার আশির্বাদ রইল।

তোমাদের চির শুভাকাঙ্খী-
এ, সি, ভক্তিবেদান্ত স্বামী

বিঃ দ্রঃ- সাথে ১০ ডলার চেক পাঠালাম।

- চলবে।

পুণ্য তীর্থগুলির প্রামাণিকতা

যদি আমরা অনুমোদিত তীর্থক্ষেত্রগুলিতে যথার্থ মানসিকতা নিয়ে যাই,
তা হলে তীর্থভ্রমণের ফলে আমাদের ভগবদ্ভক্তি উত্তরোত্তর বিকশিত হতে পারে।

– শ্রীমৎ সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হয়েও তাঁর নিজেরই ভক্তরূপে পাঁচশ বছর আগে পৃথিবীতে উপস্থিত হন, তখন প্রায়ই তিনি পুণ্যস্থানগুলিতে, অর্থাৎ তীর্থভ্রমণে যেতেন। তিনি কেবল দক্ষিন ভারতেই পরিভ্রমণ করেছিলেন, তা নয়-পৃথিবীর মাটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্যধাম বৃন্দাবনে ও তীর্থপরিক্রমা করেন।

যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবনধাম থেকে তীর্থভ্রমণে যাত্রা শুরু করেন, তখন মহাপ্রভুর যাত্রাপথ সুগম করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর ভৃত্যবর্গ এবং সৈন্যদলকে আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে পথিমধ্যে মহাপ্রভুর বিশ্রামলাভের স্থানগুলিতে প্রত্যেক জায়গায় যেন বিশেষভাবে স্মৃতিচিহ্ন তথা স্মারক-মন্দির স্থাপনা করা হয়ে থাকে। লোকে বলে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যে সব জায়গায় ক্ষণকালের জন্যও অবস্থান করেছিলেন, সেই সমস্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ তীর্থস্থানগুলি কেউ দর্শন করলে প্রভূত কল্যাণ লাভ হয়ে থাকে।

যেখানেই মহাপ্রভু গিয়েছিলেন, তাঁকে ক্ষণকাল দর্শনের জন্য এবং তাঁর আশীর্বাদ লাভের বাসনায় ধর্মপ্রাণ সাধুসজ্জন মানুষের বিপুল জনতা তাঁকে অনুসরণ করে চলত। সব মানুষকেই তিনি বিশেষভাবে কৃপা বিতরণ করতেন, তবে মাঝে-মধ্যে তাদের সকলের অজান্তে তিনি নিষ্কৃতি নিয়ে চলে যেতেন অন্য কোন খানে।

বিশাল জনস্রোত মহাপ্রভুকে অনুসরণ করে চলেছে, তাই দেখে শ্রীরাঘব পণ্ডিত তখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাড়িতে চলে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে মহাপ্রভু একটি দিনের জন্য শ্রীরাঘব পণ্ডিতের বাড়িতে অবস্থান করেন। পরদিন ভোরে তিনি কুমারহট্টে চলে যান।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী এই বিষয়ে লিখেছেন ঃ

কুমারহট্ট থেকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ায় গিয়েছিলেন, যেখানে শিবানন্দ সেন থাকতেন। শিবানন্দ সেনের গৃহে দু'দিন থাকবার পরে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বাসুদেব দত্তের গৃহে যান। সেখান থেকে তিনি নবদ্বীপের পশ্চিমপাড়ে বিদ্যানগর নামে গ্রামটিতে যান। বিদ্যানগর থেকে তিনি কুলিয়া গ্রামে যান এবং মাধব দাসের গৃহে থাকেন। সেখানে তিনি এক সপ্তাহ থাকেন এবং দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভৃতির অপরাধ ভঞ্জন করেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী এইখানে শান্তিপুরাচার্যের গৃহে ঐভাবে আগমনের কথা-উল্লেখ করার ফলে বহু লোকের মনে সন্দেহ হয় যে, কাঁচড়াপাড়ার কাছেই হয়তবা কোনও 'কুলিয়া' থাকবে। এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে এক 'নতুন কুলিয়াপাট' উৎপন্ন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, সেই রকম কোনও স্থানের অস্তিত্বই নেই। বাসুদেব দত্তের গৃহ থেকে চলে আসার পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈত আচার্যের গৃহে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি নবদ্বীপের অপর পাড়ে বিদ্যানগরে বিদ্যাবাচস্পতির গৃহে এবং কুলিয়া গ্রামে গিয়েছিলেন। এই বর্ণনা 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'; 'শ্রীচৈতন্যমঙ্গল'; 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক এবং 'শ্রীচৈতন্যচরিত' কাব্যে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী স্পষ্টভাবে এই যাত্রায় তা বর্ণনা করেননি বলে কিছু অসৎ স্বার্থান্বেষী লোক কাঁচড়াপাড়ার কাছে কুলিয়ার পাট নামক একটি স্থান তৈরী করেছে।

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য; ১৬/২০৫ তাৎপর্য)

এই তথ্য থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, পবিত্র তীর্থস্থান বলতে কোনও কোনও জায়গায় যথার্থ প্রামাণিকতা নেই। তা হলে প্রকৃত তীর্থভূমির বৈধতা বলতে কি বোঝায়?

কোনও তীর্থভূমির সঠিক স্থানমাহাত্ম্য নির্ণয় করা প্রায়ক্ষেত্রেই কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে ইস্‌কনের প্রচারকার্যের ফলে ভারতবর্ষে সাদাসিধে অনভিজ্ঞ পাশ্চাত্য তীর্থযাত্রীদের বিপুল আগমনের সাথে সাথে কিছু মানুষের পক্ষে টাকা রোজগারের ফন্দী নিয়ে যে কোনও একটা জায়গাকে একেবারে সরাসরি পবিত্র তীর্থস্থান বলে চালিয়ে দেওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে। বৈষ্ণবজনেরা এবং অন্যান্য সৎ মানুষেরা অবশ্য এই সমস্ত জায়গাগুলির প্রামাণিকতা নিয়ে প্রায়ই বেশ ভালরকম বিরোধিতা করে থাকেন।

কোনও পূণ্যতীর্থের যোগ্যতাবলী

কোনও জায়গা পূর্ণতীর্থ হয়ে ওঠার প্রধান যোগ্যতা হল এই যে, শ্রীভগবান কিংবা তাঁর শুদ্ধভক্ত সেখানে আবির্ভূত হয়েছিলেন অথবা সেখানে লীলাপ্রসঙ্গ করে গেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবজন তথা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুগামীদের কাছে, শ্রীবৃন্দাবনধাম এবং শ্রীমায়াপুরধাম হল প্রধান তীর্থক্ষেত্র। বর্তমান কলিযুগে পবিত্র তীর্থক্ষেত্রগুলি জড়জাগতিক অশুভ অপবিত্র শক্তিরাজির কবলিত হয়ে যেন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে বলে মনে হয়, তাই কখনও-বা এই সকল তীর্থস্থানের পবিত্রভাব উপলব্ধি করা বেশ কঠিন হয়ে ওঠে।

কোনও পূণ্যপবিত্র স্থান দর্শন করে আমরা যদি কিছু

অর্জন করতে চাই, তা হলে যথার্থ পারমার্থিক মনোভাব এবং বিনয়নম্র শ্রদ্ধার মানসিকতা নিয়েই অবশ্য সেখানে আমাদের যেতে হবে।

আজকাল হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের ভক্তবৃন্দ পুণ্যতীর্থ বলতে কি বোঝায়, সেই প্রশ্নে খুবই চিন্তাভাবনা করে থাকেন, কারণ তাঁরা শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়-পাশ্চাত্যেও বহু জায়গায় শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত নানা কৃষ্ণভাবনাময় কেন্দ্রে বাস করছেন। ইস্‌কনের মন্দিরগুলি কি পুণ্যতীর্থস্থান ? এখন ইস্‌কন যে সমস্ত জমি আয়ত্ত করেছে, সেগুলির অধিকাংশই বিভিন্ন মানুষ একসময়ে অধিকার করেছিল কোনও রকম তীর্থ গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ছাড়াই। মোটামুটিভাবে আমরা মন্দিরের স্থানকে তীর্থরূপে কোনও ঐতিহাসিক বৈধতা দিতে পারি না। পুণ্যতীর্থরূপে কোনও মন্দিরকে মর্যাদা অর্জন করতে হলে অবশ্যই অন্য কোনও যুক্তির ভিত্তি বিবেচনা করতে হবে।

অনেকগুলি বিষয় মিললে তবে একটা তীর্থ হয়ে ওঠে ঃ

১। সেই স্থানটিতে ভগবদ্ভক্তেরা অবশ্যই পারমার্থিক ক্রিয়াকর্মাদির অনুষ্ঠান করেছিলেন (কিংবা করে থাকেন), আর সেই তীর্থস্থানে অবশ্যই সাধুসজ্জন ব্যক্তিরা দর্শন করতে আসেন। বাস্তবিকই, বৈদিক শাস্ত্রাদিতে বলা হয়েছে যে, কোনও মানুষ ইতিহাস-বিখ্যাত তীর্থস্থানগুলিতে গিয়ে যদি কেবল স্নান- করেই চলে আসে, তবে সে গরু-গাধার চেয়ে ভাল কিছু নয়। তীর্থদর্শন বলতে বোঝায়-সেখানে উপস্থিত সাধুসজ্জনদের সঙ্গলাভ করা। চাণক্য পণ্ডিতও বলে গেছেন যে, সাধুসজ্জনবর্জিত কোনও জায়গা পরিহার করে চলতে হয়। আর, যে-জায়গায় কৃষ্ণকথা তথা ভগবৎ বিষয়ক আলোচনা কিছুই হয় না এবং শ্রীভগবানের সেবা-ভক্তি অনুশীলনের আয়োজন যেখানে নেই, সেই জায়গাটি পবিত্র তীর্থভূমির মর্যাদা দাবি করতেই পারে না।

২। তীর্থ দর্শনের মাধ্যমে আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের সঞ্জীবনী অর্জনের অনুভূতি লাভ হওয়া চাই। তীর্থভূমিতে সেই মর্যাদার প্রাধান্য থাকতে হবে-ভগবদ্ভক্তি অনুপ্রেরণার উৎসস্থল হতে হবে।

৩। শ্রীভগবানের পবিত্র নামকীর্তনই তীর্থস্থানে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যরূপে বিরাজমান থাকা চাই। তার সাথে একান্ত আনুষঙ্গিকভাবে থাকা উচিত শ্রীবিগ্রহের অর্চনা-আরাধনা। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আমাদের বলতেন যে, সমস্ত পৃথিবীতে তিনি যতই বিভিন্ন রূপের শ্রীবিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠা করেছেন ততই তাঁর বড় দুশ্চিন্তাবোধ হত যে, তাঁর শিষ্যবর্গ বুঝি এইভাবে নিত্য নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা আরতি-পূজার ব্যাপারটিকে তাদের 'কাঁধের ওপর বোঝা' মনে করতে শুরু করবে। কিন্তু যদি শ্রীবিগ্রহ-আরাধনা অবিরামভাবে অনুশীলন করা হতে থাকে, এবং সেই অঞ্চলের ভক্তমন্ডলী শ্রীবিগ্রহের চরণাশ্রয় গ্রহণ করে, তবে সেই স্থানটি বড়ই পূণ্য পবিত্রতার মর্যাদা অর্জন করতে থাকে।

৪। শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ পূণ্যপবিত্র তীর্থভূমির সংজ্ঞা নিরুপণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতের মর্যাদা যেখানে তুলে ধরা হয়, সেই স্থানটিও মর্যাদা লাভ করে। সেটি হয়ত কোনও এক বিশাল মন্দিরভবন হতে পারে, কিংবা গাছতলাতেও হতে পারে ; আর তা ভারতবর্ষেও হতে পারে, কিংবা জগতের অন্য যে কোনও জায়গাতেও হতে পারে-যেখানেই শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে বারংবার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করা হয়, সেই স্থানটি হয়ে ওঠে পূণ্যপবিত্র।

তীর্থযাত্রার পথে বাধাবিঘ্ন

কোনও বিশেষ পূণ্যস্থান দর্শন করতে না যাওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে কিনা, তাই নিয়ে অনেক সময়ে ভক্তেরা চিন্তা-ভাবনা করে থাকে। অবশ্য, পর্যটনের ব্যাপারটা তো সব সময়ে নানা অসুবিধায় পূর্ণ থাকেই।

একটা অসুবিধা হতে পারে-সেটা হল রাজনৈতিক ব্যাপার। পূণ্যস্থানগুলি হয়ত অকস্মাৎ রাজনৈতিক কারণে দেশ-বিভাজনের মধ্যে পড়ে যায়, যাতে সেই স্থান দর্শনে যাওয়া কষ্টকর, এমনকি অসম্ভব হয়ে উঠতেও পারে। এক সময়ে যেসব জায়গা ভারতবর্ষের অংশ ছিল, পরে পূর্বপাকিস্তানের অংশ হয়ে যায়, আবার পরে হয় বাংলাদেশ।

দুই দেশের মধ্যে যদি রাজনৈতিক বিবাদ চলে, তা হলে আমরা তীর্থভ্রমণের নাম করেও সীমানা পেরিয়ে অন্য দেশে ঢুকতে পারি না। রাজনৈতিক দেশবিভাগের ফলে একটা তীর্থস্থান লুপ্ত হয়ে যেতেও পারে। গঙ্গানদীর গতি পরিবর্তনের ফলেও যেমন মহাপ্রভুর লীলাময় বিস্তীর্ণ অঞ্চল আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছে।

হয়ত বংশানুক্রমে আজ থেকে বহুদিন পরে শ্রীভগবান অথবা তাঁর শুদ্ধভক্তবৃন্দের কৃপায় সেইগুলির পুনরুদ্ধার হবে এবং তীর্থযাত্রীরা আত্মশুদ্ধির বাসনায় আবার তখন সেইসব স্থান দর্শন করতে পারবে।

আরও একটি অসুবিধা হতে পারে-সেটি হল পরিভ্রমণের ব্যাপারে আমাদের নিজেদের কোনও অক্ষমতা। এছাড়া অন্য একটি ব্যাপার হল- তীর্থক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য নিজেদের যোগ্যতার বিষয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মনোভাব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তবৃন্দ কোন দিন গোবর্ধন পর্বতের মন্দিরগুলি দর্শন করতে যাননি, এবং শ্রীরাধাকুণ্ডের সরোবরে কোনও দিন শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহাশয় স্নান করেছিলেন কিনা সন্দেহ আছে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নবদ্বীপ-অনুগামীদের কেউ কখনই শ্রীবৃন্দাবন তীর্থদর্শন করেননি।

তীর্থদর্শন করতে গেলে যোগ্যতাবলী থাকা চাই। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর রচিত 'নবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ' গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। ঈশোদ্যানের বর্ণনা

দিয়ে সেটিকে তিনি 'ভগবানের উদ্যান' বলেন, এবং তারপরে তিনি লিখেছিলেন যে, নবদ্বীপে কেউ যদি এই স্থানটি দেখতে আসে, তবে শুধুই কাঁটা ঝোপ দেখতে পাবে। তবু যাঁদের যোগ্য দৃষ্টিক্ষমতা আছে, তাঁরা সেখানে শ্রীভগবানের উদ্যানই দেখতে পাবে-যেমনটি তিনি বর্ণনা করে গেছেন, তেমনই। যথার্থ যোগ্য দৃষ্টি না থাকলে, বাস্তবিকই কোনও পূণ্যভুমি দর্শন হয় না।

পুণ্যস্থানগুলিতে যেমন বাস্তবিকই জড়জাগতিক কিছু সমতা লক্ষ্য করা যেতেই পারে, তা ছাড়াও ভক্তিমূলক শাস্ত্রাদির মধ্যে দিয়ে সেইগুলির যেমন বর্ণনা পাওয়া যায়, তার মধ্যেও একটা বৈধতা অবশ্য লক্ষ্যণীয়। শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুরের সময়ে, ভারতীয় লোকেরা একজন ব্রিটিশ অফিসারকে হত্যা করার ঘটনা নিয়ে যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল এবং তার ফলে ইংরেজরা তাদের কামান-বন্দুক সব যেভাবে তাক করেছিল একটা মন্দির ধ্বংস করে দেবার মতলবে, তাই দেখে ভক্তিসিদ্ধান্ত ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন যে, ব্রিটিশরা যদিও মনে করেছিল, তারা শ্রীকৃষ্ণকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে, তারা কিন্তু নিছক একটা মন্দিরকেই ধূলিসাৎ করে দিতে পেরেছিল।

কোনও তীর্থ যদি এইভাবে আমাদের দৃষ্টিসীমা থেকে অন্তর্হিত হয়ে যায়, রাজনীতি কিংবা কালের কবলে পড়ে, তা হলে শ্রদ্ধাভরে শাস্ত্রাদি অধ্যয়নের মাধ্যমে-সেটি স্মরণের মাধ্যমে আবার দর্শন করতে পারি। কোনও শুদ্ধ ভক্তের কৃপাতেই একটা তীর্থস্থান আত্মপ্রকাশ করে এবং শ্রবণের মাধ্যমে সেই তীর্থদর্শন করা সম্ভব হতে পারে।

শাস্ত্রাদির মাধ্যমেও সেই কথা বলা হয়েছে যে, সারা জগৎ ঘুরে ঘুরে পূণ্যতীর্থগুলি দর্শন করে বেড়ানোর দরকারই হয় না। অদম্য ভ্রমণপিপাসার ফলেই সব সময়ে দেখি তীর্থভ্রমণের প্রবণতা রয়েছে বহু মানুষের এবং তার পরিণামে নিছক বাহ্যিক নৈসর্গ দৃশ্যগুলি দেখে ফিরে আসাই হয়। অবশ্য কিছু ভক্তের মনের মধ্যে তীর্থভ্রমণের মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের এক নিবিড় অনুভূতি হতেও পারে, আবার অন্য অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায়-তাঁদের গুরুদেব যে ব্রতসাধনে নিয়োজিত করেছেন, সেই সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করার মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় মনোনিবেশ করা এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা বিষয়ক তীর্থাদি আস্বাদনের সৌভাগ্য তাঁদের হয়ে যাচ্ছে।

ইহজীবনে আমাদের অতি সীমিত ক্ষমতা নিয়ে চলেছি; তবু তীর্থাদি দর্শন করা তো শুধুমাত্র একটি সর্বাঙ্গীণ সেবাকার্যের মতোই কারও জীবন ভরিয়ে রাখতে পারে-অনেকে তা করতেও পারেন। তবে আমাদের গুরুদেব অনেক সময়ে তীর্থাদি ভ্রমণ ও দর্শন ছাড়াও অন্য কোনও সেবাকার্যের দায়িত্বভার অর্পণ করতেও পারেন এবং তীর্থাদি ভ্রমণ করার চেয়ে গুরুদেবের সেই আদেশ কার্যকরী করে তোলার মাধ্যমেই আমরা অনেক উন্নতি লাভ করতে পারি।

শ্রীনরোত্তম দাস ঠাকুর আমাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন যে, শুধুমাত্র শ্রীবৃন্দাবনধাম কিংবা শ্রীমায়াপুরধাম দর্শনের মাধ্যমেই আমরা সমস্ত তীর্থদর্শনের পুন্য অর্জন করতে পারি। তিনি আরও বলেছেন যে, কলিযুগে তীর্থভ্রমণ করা যেমন বিভ্রান্তিকর, তেমনই আনন্দজনকও বটে।

কোনও পূণ্যস্থানের সেবা করতে হলে সেখানকার ভক্তিমূলক কার্যসূচির মধ্যে অংশগ্রহণ করতে হয়-কেবল দর্শক হয়ে সেখান থেকে ঘুরে চলে এলেই লাভ হয় না-হয় শুধু পন্ডশ্রম আর বৃথা ব্যয়। পুণ্যভূমির বিশেষ তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করা চাই এবং তার পরে নবজীবন লাভের আকুলতা নিয়ে সেই তাৎপর্য নিজের কাজে-কর্মে প্রতিফলিত করার জন্য উদ্যোগী হওয়া চাই।

প্রত্যেকটি পবিত্র স্থানের একটা অন্তর্নিহিত বাস্তব সত্য স্বরূপ থাকে। সব সময়ে আমাদের তা বোঝবার মতো যোগ্যতা থাকেই না,-বিশেষ করে দর্শনীয় বস্তুগুলি দেখবার মন নিয়ে নিছক পর্যটনকারীদের মতো ঘুরপাক দিয়ে ফিরে আসতেই চাই। সেই ব্যাপারটা যে কেবল বৃন্দাবন আর মায়াপুর দর্শন সম্পর্কেই ঘটে, তাই নয়-ইসকনের মন্দিরগুলির দর্শকদের আচরণেও তাই দেখা যায়।

কোন বিশেষ জায়গার মাহাত্ম্য সম্পর্কে আমরা যদি সেখানকার ঐতিহাসিক প্রামাণিকতা বিচার করতে বাস্তবিকই উদ্যোগী হতে পারি, তা হলে যথার্থ জ্ঞানচক্ষু দিয়ে সবকিছু দেখতে শেখা চাই। যখন অর্জুন আর তাঁর ভাইদের ধনুর্বিদ্যা শেখানো হচ্ছিল, তখন শুধুমাত্র অর্জুনই লক্ষ্যস্থলের পাখিটির চোখটি ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছিলেন না। শুধুমাত্র তিনিই লক্ষ্যভেদ করতে পেরেছিলেন।

ঠিক তেমনই, যে কোনও স্থানের অন্তস্থলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করবার মতো শিক্ষা আমাদের আয়ত্ত করতে হবে এবং শুধুমাত্র বহিরাবরণগুলি দর্শন করলেই কাজ হবে না, উৎকট ত্রুটি-বিচ্যুতি কিংবা অভাব-অভিযোগ নিয়ে মাথা ঘামিয়েও লাভ নেই। আমাদের শুধুমাত্র দেখতে হবে-সেখানে সাধুসজ্জন কারা আসছেন এবং কোন্ উদ্দেশ্যে তাঁরা পুণ্যভূমিতে এসে কালযাপন করছেন, সেই উদ্দেশ্যটিও মনেপ্রাণে অনুভব করবার প্রয়াস থাকা চাই। কোনও তীর্থভূমির পারমার্থিক মর্যাদার সারমর্ম বুঝতে হলে, সেখানকার শুদ্ধভক্তবৃন্দের নিষ্ঠা আর ভক্তিমূলক আচরণগুলি অনুধাবন করে, অন্য সব কিছু থেকে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়া চাই।

এমন স্বচ্ছ দৃষ্টি না থাকলে, তীর্থভূমিতে আমরা রবাহূত অবাঞ্ছিত পর্যটকদের মতোই অপাংক্তেয় হয়ে ফিরে আসব-পূণ্য পবিত্রভূমির শ্রেষ্ঠতা আমাদের কাছে কোনদিনই উপলব্ধি হবে না।

('ব্যাক টু গডহেড' পত্রিকার সৌজন্যে)

প্রভুপাদ পত্রাবলী

সান্‌ফ্রানসিসকো

প্রিয় জনার্দন   ২২ শে জানুয়ারী, ১৯৬৭

গত ১৭ জানুয়ারী ১৯৬৭ তারিখের পত্রের জন্য তোমাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। যদিও সেটি হস্তগত হয় নিউইয়র্ক থেকে ফিরে এসে। আমি ১৬ তারিখে ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের জেট প্লেনে করে এখানে পৌছাই। তোমাকে আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, এখানে বিশেষ করে আমার ছাত্র মহিক এবং হারভে আমাকে বিশেষভাবে সংবর্ধনা দেবার সুব্যবস্থা করে। এখানকার কেন্দ্রটি খোলা এবং ঠিক নিউইয়র্ক কেন্দ্রটির মতই। আমরা প্রতিদিনই সেবার ব্যবস্থা রেখেছি। তবে এদের মধ্যে কয়েকজন আজ দীক্ষা প্রাপ্ত হবে।

এখন তোমার পালা শুরু হল, ঠিক এমন একটি কেন্দ্র মন্ট্রিয়েলে স্থাপন করা। কেন্দ্রটি স্থাপন করার মূল্য উদ্দেশ্য হবে কৃষ্ণভাবনামৃতের আদর্শ প্রচার করা। আমার অবর্তমানে আমেরিকার ছাত্ররা খুব সুন্দরভাবে এই কেন্দ্রটি পরিচালনা করছে। যদিও তারা আমার অনুপস্থিতি অনুভব করে তথাপিও, তারা নিরুৎসাহিত নয়। তারা খুব সুন্দর এবং সঠিকভাবে সেবাকার্য পরিচালনা করছে। আমার বিশ্বাস তারা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বাড়ি ক্রয় করতে সমর্থ হবে। বাড়ী ক্রয়ের ব্যাপারে আশিভাগ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তাঁরা দুই লাখ ডলার পরিশোধ করার মত মস্ত বড় দায়িত্ব নিয়েছে। তারা খুবই উৎসাহী, আমি আশা করি তুমিও এমন একটি কেন্দ্র মন্ট্রিয়েলে স্থাপন করবে। আধ্যাত্মিক জীবনেও কৃষ্ণের তুষ্টি বিধানের জন্য প্রতিযোগিতা থাকা প্রয়োজন।

আমি আশা করি, তুমি ১৯৬৭-র এপ্রিলের দিকে অথবা তারও পূর্বে তোমার ওখানে নেবার ব্যবস্থা করবে। ভারতে ফিরে যাবার প্রাক্কালে যদি অন্ততঃ তিনটি কেন্দ্র স্থাপন করতে পারি তারমধ্যে একটি নিউইর্য়কে আরেকটি সান্‌ফ্রানসিসকোতে অন্যটি মন্ট্রিয়েলে, তাহলে আমি আমার উদ্দেশ্য সফল করতে পেরেছি বলে মনে করবো। আশা করি, তুমি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতা করবে।

আমেরিকা থেকে আমার সাথে এসেছে এবং তোমার এপার্টমেন্টে ত্যার জিনিষপত্র রয়েছে এ ব্যাপারে তার পত্র পেয়ে থাকবে।

আমি এই পত্রের সাথে একটি সংবাদের কাটিং সংযুক্ত করে দিলাম, যা এটির সাক্ষ্য বহন করবে। আশা করি তোমরা কুশলে আছ, মিসেস ডামবার্গের প্রতি আমার শুভেচ্ছা রইল। মেয়েটি খুবই বুদ্ধিমান, তাকে খুব ভালভাবে পৃথিবীতে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচারের উদ্দেশ্য অবগত করাবে।

তোমাদের স্নেহধন্য

এ,সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী

সান্‌ফ্রানসিসকো

প্রিয় ব্রহ্মানন্দ,   ২৫ শে জানুয়ারী, ১৯৬৭

আমি ২১শে জানুয়ারী যথাসময়ে তোমার পত্র পেয়েছি। গতকাল আমি পাঁচটি টেপ পেয়েছি তার মধ্যে দুটি টেপ রেকর্ড করে ফেরত পাঠালাম। আমি যতদিন এখানে আছি। প্রতিদিন দুটো করে টেপ রেকর্ড করে পাঠাবো, তেমনি তুমিও প্রতিদিন দুটো করে টেপ আমাকে পাঠাবে, যাতে করে কোন রকম অসুবিধার সৃষ্টি না হয়।

যখন আমি সান্‌ফ্রানসিসকো যাচ্ছিলাম তখন কীর্তনানন্দ ও গর্গমুনিকে বলেছিলাম একটি টেপের রীল ভারতে রেখে আসতে। এটা প্যাক করা নিম্নোক্ত ঠিকানায় রয়েছে। শ্রীরাধারমন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রী গৌড়ীয় সংঘাশ্রম, ২৩, উল্টর লেন, কলিকাতা-১৪, ভারত। আমি খুবই চিন্তিত হয়ে আছি যে, ঐ রীলটি কি ইতিমধ্যে এয়ারমেলে পাঠানো হয়েছে। যদি না পাঠানো হয়ে থাকে, তাহলে অবিলম্বে এটা পাঠাবে। আমি ব্রহ্মচারীর পত্র পেয়েছি, উনি এই টেপের রীল এখনও পান নাই। সুতরাং এই পত্র পাওয়া মাত্রই অতি জরুরীভাবে এটা পাঠানোর ব্যবস্থা নেবে।

শ্রীমান করলাপতি (কার্লা ইয়ারগানস) আমাকে দশ ডলারের একটি চেক পাঠিয়েছে, যেটি তাঁর একাউন্টে জমা করবে। সে আরো জানিয়েছে, তাঁর এক আত্মীয় যিনি আরো পঞ্চাশ ডলার পাঠাবে। যদি পেয়ে থাক, তাহলে করলাপতিকে জানাবে, তাঁর ডলার প্রাপ্তি সম্পর্কে। তাঁর গ্রীসের ঠিকানা নিম্নে দেওয়া হল। কে,ইয়ারগান্‌স, পোষ্ট বেসটানটি, লিভোস, রোডস, গ্রীস।

তাঁকে অবশ্যই ব্যাগ টু গড হেড পত্রিকার ও অন্যান্য পত্র পত্রিকার কপি পাঠাবে। সে ভগবদগীতার উপর আমার ভাষ্য পাওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আমাকে জানাতে ভুলবে না যে, আমেরিকা থেকে ভগবদগীতা ছাপানোর কোন ব্যবস্থা আছে কিনা, না হলে অনতিবিলম্বে আমি ভারতে এর প্রকাশনার ব্যবস্থা নিচ্ছি। ইতিমধ্যে ভগবদগীতার অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা সমাপ্ত হয়েছে। আমি চৈতন্য চরিতামৃতের ভাষ্য ও ব্যাখ্যা শুরু করেছি। যদি মিঃ নীলের মত একজন বিশেষ টাইপরাইটার পারদর্শী পেতাম, তাহলে আমরা প্রতি তিনমাসে একটি করে বই ছাপাতে পারতাম। যদি এভাবে আমরা আরো বই প্রকাশ করতে পারতাম, তাহলে আমরা সম্মানিত হতাম।

আমরা জেনেছি যে, ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচ হাজার ডলার আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের একাউন্টে জমা হয়েছে। আমার ২৩শে জানুয়ারী ১৯৬৭ তারিখে প্রেরিত পত্রে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, আইনজীবির বিশেষ তত্ত্বাবধানে বাড়ীওয়ালাকে টাকা পরিশোধ করতে। ভারতে সাধারণ নিয়ম হচ্ছে বাড়ীওয়ালাকে টাকা পরিশোধ করা মাত্রই বাড়ীর দখল বুঝে নেওয়া, আমার ধারণা যে, এই দেশেও সেই একই নিয়ম রয়েছে।

এছাড়া মিঃ জনাথন অলটম্যানকে কিছু বাদ্য যন্ত্রাদি কেনার জন্য আমার একাউন্ট হতে ২০০ ডলার ৪র্থ রাস্তার ট্রেড ব্যাংক ট্রাষ্ট কোং এ পাঠাবে। এ মাসে যথারীতি তাকে চেকটি পাঠাবে, কিন্তু তাকে জানিয়ে রাখবে যে, ভারত থেকে বাদ্য যন্ত্রাদি ক্রয় করা হবে। যন্ত্রাদির মূল্য প্রায় পাঁচ হাজার

(১২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

বেদনিষ্ঠ-মধ্যে অর্দ্ধেক বেদ 'মুখে' মানে। বেদ নিষিদ্ধ পাপ করে ধর্ম্ম নাহি গণে॥

অদ্বৈতবাদ (মায়াবাদ) বনাম দ্বৈতবাদ (ভক্তিবাদ)

– শ্রী মনোরঞ্জন দে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলেছেন ঃ-

"ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥"

–অর্থাৎ ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি, এবং অহংকার এই অষ্ট প্রকারে আবার ভিন্ন জড়া প্রকৃতি বিভক্ত। পরমেশ্বর ভগবান আরোও বলেন ঃ-

" অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ॥" (গীতা ৭/৫)

–অর্থাৎ হে মহাবাহো (অর্জুন) এই নিকৃষ্টা প্রকৃতি ব্যতীত আমার আর একটি উৎকৃষ্টা প্রকৃতি আছে। সেই প্রকৃতি চৈতন্য স্বরূপা এবং জীবভূতা। সেই শক্তি থেকে সমস্ত জীব নিঃসৃত হয়ে এই জড়জগতকে ধারণ করে আছে।

বাস্তবে আবদ্ধ জীবকে জড়-জগতে অবস্থান করতে হয়। তাই জড়-জগতের অস্তিত্ব নেই– একথা সে বলতে পারে না। বৈষ্ণব আচার্য্যগণের মতে এই জড়জগতে অবস্থান করেও জীব দু'টি উদ্দেশ্যের মধ্যে যে কোন একটি সাধন করতে পারে।

(১) জীব মায়া (অপরা প্রকৃতি– ভগবানের নিকৃষ্ট শক্তি) দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে জড়-জাগতিক বা ইন্দ্রিয় ভোগে লিপ্ত হয়ে কর্ম অনুযায়ী দেহান্তরের চক্রে আবর্তিত হতে পারে।

(২) জীব পরাশক্তির অধীনস্থ হয়ে মুক্তি পেয়ে তার চিন্ময় রূপে ভগবৎ ধামে উপনীত হতে পারে।

এই জড় জগৎ হল জীবের জন্য একটি নাট্যমঞ্চ (stage of drama)। জড় জগৎ বাস্তব এই অর্থে যে, এটি পরমেশ্বর ভগবানের নিকৃষ্ট বা অপরা শক্তির প্রকাশ (manifestation of inferior energy)। আবার মায়া এই অর্থে যে এটি অনিত্য/অস্থায়ী (temporary)। সুতরাং দেখা যায় অদ্বৈতবাদের মায়া ধারনা থেকে দ্বৈতবাদের মায়া ধারনা একেবারেই পৃথক। বদ্ধ জীব ভুল করে এই জড়-জগৎকে তাদের প্রকৃত আবাসস্থল বলে মনে করে। এরূপ ভুলকেই দ্বৈতবাদীরা মায়া বলেন যা অতিক্রম করা কঠিন। জীবের প্রকৃত/আসল আবাসস্থল হল পরমেশ্বর ভগবানের চিৎজগত। একমাত্র ভগবানের শরণাগত হলেই ঐ জগতে জীব উপণীত হতে পারে। এইজন্যই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন ঃ

"দৈবী হ্যেষা গুনময়ী-মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥"

অর্থাৎ, আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুনাত্মক এবং তা দুরতিক্রম্য। কিন্তু যারা আমাতে প্রপত্তি (শরনাগত) করে তারাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও বলা হয়েছে ঃ

"মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম।"

অর্থাৎ, মায়া যদিও মিথ্যা বা অনিত্য তবুও মায়ার উৎস হলেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান। (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪/১০)

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য তাঁর অদ্বৈতবাদ তথা মায়াবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিভিন্ন উপনিষদের ভাষ্য বা তাৎপর্য রচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বৃহদারন্যক উপনিষদে এই শ্লোকটি রয়েছে ঃ

"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষ রূপ ঈয়তে।
যুক্তা হাস্য হরয়ঃ শতা দশেতি ॥"
(২/৫/১৯)

অর্থাৎ ইন্দ্র মায়ার সাহায্যে বিরাট আকার ধারণ করেছেন; তাঁর রথের সংখ্যা দশ শত। শঙ্করাচার্য্য এই উক্তির রূপক ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে ইন্দ্রের স্থলে ব্রহ্মকে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু এর পেছনে কোন শক্তিশালী যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। কারণ এই বচন/উক্তিটি ঋগ্বেদের ষষ্ঠ মন্ডলের ৪৭ নং সুক্ত থেকে উদ্ধৃত এবং সেখানে নিশ্চিতভাবে তা সরল অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। ইন্দ্র সেখানে স্বর্গের দেবতাদের মধ্যে অন্যতম দেবতা মাত্র।

প্রাচীন উপনিষদ সমূহ গভীরভাবে বিশ্লেষন করলেও দেখা যায়, এতে মায়াবাদের বীজ আছে। পরোক্ষ সমর্থন আছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ বা সরাসরি সমর্থন নেই। কেবলমাত্র শঙ্করের নিজস্ব চিন্তাধারা বা ভাষ্যে তা পরিস্ফুট হয়েছে মাত্র। যেমন, বৃহদারন্যক উপনিষদে ব্রহ্মের দুই রূপের কথা উল্লেখ আছেঃ মূর্ত এবং অমূর্ত রূপ।

"দ্বে বাব ব্রহ্মনো রূপে মূর্তং চৈবামূর্তঃ চ।
(বৃহদারন্যক উপনিষদ ২/৩/১)

এক্ষেত্রে মূর্তরূপের কৃত্রিমতার কথা অবশ্য ইঙ্গিত করা হয় নাই। তবে অমূর্ত রূপ যে অদ্বৈত রূপ হয়ে দাড়াঁয় তা বোঝা যায়। এই অদ্বৈত রূপের একটি বর্ণনা কঠ উপনিষদেও পাওয়া যায়। সেখানে বলা হয়েছে "সেই অবস্থায় তিনি (ব্রহ্ম) অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অভ্যয়, অনাস্বাদেয়, নিত্য এবং অগন্ধ। (কঠ উপনিষদ ১/৩/৫)।

উপরোক্ত শ্লোকগুলির মধ্যে মায়াবাদের পরোক্ষ সমর্থন আছে বলে মনে হয়। তবে একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে প্রাচীন উপনিষদ গুলোর বচনের মধ্যে মায়াবাদের প্রত্যক্ষ সমর্থন নেই। কারণ উপনিষদের ভুল ভাবধারা হচ্ছে পরম সত্যের (ভগবানের) স্বাভাবিক গতি হল বিশুদ্ধ একক অবস্থা থেকে বহু এবং বিচিত্ররূপে আত্ম প্রকাশ করা। কারণ তিনি নিজেকে দুই করে এবং বহু করে আনন্দ পান। তিনি সর্বশ্রেষ্ট শিল্পী। (চলবে)

রম্য রচনা

পথিক–গন্তব্য

– শ্রী অভাজন রায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পথিক ঃ বল তবে বল; পিত্তি জ্বলে ওঠা তোমার তত্ত্ব কথা।

গন্তব্য ঃ তোমার মুখে বলা বিবেকানন্দ মহাশয়ের বক্তব্যের এবার শাস্ত্রীয় বিচার শোন। বিভিন্ন প্রাণীর রক্ত-মাংস-হাড়-গোড় চিবিয়ে খেলে তামস প্রবৃত্তি মাথা চাড়া দেয়। ফলে মানবের শুদ্ধ চেতনা অশুদ্ধ হয়। মানব অধঃপতিত হয়।- আধ্যাত্মিক অঙ্গন থেকে। মানবকুল তখন প্রমাদ ও মোহগ্রস্ত হয়। তখন সম্ভাবনা থাকে না অধ্যাত্ম উন্নতির। এজন্যে সাত্ত্বিকাহার তথা শষ্যদানা, ফল-মূলাদি ভগবানকে নিবেদনের মাধ্যমে তা গ্রহন বিধেয়। স্বামীজী বলেছেন, 'দেশটা তমোগুণে ডুবে যাচ্ছে; চাই রজোগুণের উদ্বোধন।' রজোগুণের উদ্বোধনে কি দেশ আনন্দে টগবগ করবে, মঙ্গলে উথলে পড়বে-এবার তাই বিচার্য। গীতা বলেন, রজোগুণের উদ্বোধনে মানবের লোভ, বিষয় ভোগের বাসনা বৃদ্ধি পায়। গীঃ ১৪/১২॥ এবং দুঃখ ক্লেশ ভোগ হয়। **রজস্ত ফলং দুঃখম্**॥ গীঃ ১৪/১৬॥

গীতার গান তাই জানাচ্ছেন-
**রাজসিক কর্মে হয় দুঃখই প্রবল ॥
তামসিক কর্ম যত হয় অচেতন।
অজ্ঞানতা ফল সেই পশুতে গমন ॥**

রজোগুণের উদ্বোধন ঘটানো হলে মানবের দুঃখই প্রবল হবে। আর স্বামীজী নিশ্চয়ই মানবের কাধে দুঃখের বোঝা চাপাতে চান নি। তবে গীতার গানের সাথে স্বামীজীর গানের সুরের বড়ই অমিল। বড়ই বেসুরা শোনায়। আর স্বামীজীর 'জীবে প্রেম' তত্ত্বের সাথে জীবকে শানিত তলোয়ারে মেরে রেধে খাওয়া তত্ত্বও কি মেলানো সম্ভব ? তুমি কি জান, স্বামীজী মাংস ভোজী ছিলেন ? তিনি স্বয়ং বলেছেন, 'আমি মাংস খাই।' তাহলে জীবে প্রেম করে যেইজন'- এর স্বার্থকতা থাকল কোথায় ? এছাড়া বিবেকানন্দ নিজে চা, কফি, তামাক, সিগারেট, চুরুট এসবে আসক্ত ছিলেন। (বাণী ও রচনা-২ পৃঃ ১৭৩;এবং সুঃ যুঃ পৃঃ ৩০) ॥ এগুলো Intoicant অর্থাৎ মাদক দ্রব্য এবং তমোগুণ বৃদ্ধিকারক। গীতা বলেন, তমোগুণে আচ্ছন্নব্যক্তির মৃত্যু হলে পশুযোনিতে জন্ম হয়। মূঢ় যোনিসু জায়তে। গীঃ ১৪/১৫॥ অথবা নরকাদি নিম্নলোকে অধঃপতিত হয়। অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ গী ১৪/১৮ ॥ রজঃ এবং তমঃ এই উভয় গুণই সর্বনাশের বীজ। অতএব রজোগুনের উদ্বোধন সর্বনাশের উদ্বোধন নয় কি ? এবার তোমার চোখ বন্ধ করে বিবেচনা কর।

'বিবেকানন্দের মতবাদ যে অজস্র ভ্রান্তিপূর্ণ, এবং তা যে ভগবদ্গীতার শিক্ষা ধারার সঙ্গে অসঙ্গতি- পূর্ণ, কখনো বা সম্পূর্ণ বিরোধী তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।'

পথিক ঃ হুঃ বটে বদ্ধো, দুঃসাহস বটে তোমার ছোট মুখে বড় কথা বড়ই বিদঘুটে। তুমি সাচ্চা ইচোড়ে পাকা দেখছি। পাইক পেয়াদা হয়ে ফরমান জারি করছো-জজ সাহেব কে?

গন্তব্য ঃ কি বলতে চাচ্ছ ? খুলো বলো। অনর্থক বাক্য ব্যয় নিষ্প্রয়োজন।

পথিক ঃ বলছিলাম ইয়ে মানে স্বামীজীকে এতো ছোট করে দেখছো কেন ?

গন্তব্য ঃ ছোট করে দেখছি না। স্বামীজীকে ছোট করে দেখার ধৃষ্টতা কোথায় আমার? আমি কেবল শাস্ত্রের কষ্টিপাথরে তাঁর বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করছি। ঠিক যেমন জহুরি জহরতের উৎকর্ষ বিচার করে। আমি আর উত্তর বাড়াইয়া তোমার বিরাগ ভাজন হতে চাই না। তোমার মাথার ঠান্ডা ঘিলু গরমে উথাল-পাথাল করুক এ বাঞ্ছা আমার নয়। তাই এই পর্যন্তই।

পথিক ঃ আচ্ছা, তা না হয় মেনে নিলাম। তবে মাছ-মাংস খাওয়া নিয়ে বোষ্টমরা এত ঝুটি গরম করেন কেন ? ওরা কি বাংলার ঐতিহ্য 'মাছে-ভাতে বাঙ্গালি' নস্যাৎ করতে চায় ? ওরা কি জানে না যে ওগুলি আমাদের তৃপ্তির জন্যেই স্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন। তাছাড়া বোষ্টমদের দলিলেইতো নাকি লিপিবদ্ধ আছে, **'জীবো জীবস্য জীবনম'**- অর্থাৎ এক জীব অন্য জীবের আহার। হয়ত সেই জন্যেই স্বামীজী বলেছেন, 'তোর যত খুশী মাছ-মাংস খা।'

গন্তব্য ঃ তুমি'ত কালিদাস পন্ডিতের মতো কথা বলছো। অথচ আচরণ করছো মূর্খের মতো। অবশ্য কালিদাসও নাকি জীবনের প্রথম দিকে মূর্খ ছিল বলে জনরব আছে। গাছে উঠে গাছের ডালে বসে নাকি তিনি ডাল কাটতেন। জ্ঞানীত্রয় তাকে সেভাবে ডাল কাটতে নিষেধ করলেও তিনি কর্ণপাত করেন নি। তবে কাটানো ডালের সাথে বারবার মাটিতে পড়ে নাকানি চোবানি খাবার পর কালিদাসের আক্কেল হয়েছিল। সেই থেকে আর তিনি ডালে বসে ডাল কাটেন নি। তোমার কবে আক্কেল হবে, তা কৃষ্ণ ঠাকুরই জানেন।

আর হ্যাঁ স্বামীজীর কথাবার্তা নিয়ে আর বাড়াবাড়ি করার রুচি নেই আমার। তবে একথা বলতে পারি যে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য স্রষ্টা ঐ সমস্ত জীব (মাছ, ছাগল, ভেড়া, গরু ইত্যাদি) সৃষ্টি করেন নি। যেহেতু তুমি ভোগেচ্ছু বাসনা-পোষন করছ, তাই ভোগের দোলনে দুলছ। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্যে হন্যে হন্যে ছুটছো। অথচ একবারও কি ভাবছ যাঁর কাছে এই ইন্দ্রিয়গুলো পেয়েছ তাঁর কথা। মূলতঃ তুমি-আমি-আমরা কেউ ভোক্তা নই। কেবল ভগবান শ্রীকৃষ্ণই ভোক্তা। ভোক্তারং। গীঃ ৫/২৯ ॥ যেহেতু তুমি ইন্দ্রিয়ের দাস হয়ে পড়েছ, তাই জগতের সকল কিছুকেই ভোগের উপাদান ভাবছ। ঠিক যেমন, কামুক ব্যক্তি জগতের নারী সকলকে বারবনিতা ভাবে-তদ্রুপ। **কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ঃ জগতঃ**॥ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলো নিরন্তর ভোগ প্রবনে প্রবল পরাক্রান্ত। এই ভোগের বাসনা যিনি সমূলে হরন করতে পারেন, আচার্যগণ তাকেই 'হরি' বলেন। আর এই 'হরি-'ই ব্রজেপশনয় শ্রীকৃষ্ণ। ভাগবত জানায় শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি যদি জীবের চিত্তে উদয় হয়, তবেই ভোগবাসনার অভদ্র হস্তের আক্রমন থেকে বিমুক্তি। তবেই নিষ্কৃতি। নচেৎ নয়।

– চলবে।

সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। ইহা হৈতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥

যত নগরাদি গ্রামে

নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট শ্রীমৎ ভক্তিতীর্থ স্বামী মহারাজ

বিগত ২৭শে জুন সোমবার বেলা ৩টা ৩৫ মিনিটে আমেরিকার পেনসিলভ্যানিয়ায় ইসকন ভক্ত পল্লীর 'গীতা নগরী'তে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের (ইসকন) অন্যতম আচার্য ও.জি.বি.সি পৃথিবীর প্রথম আফ্রো-আমেরিকান বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ও কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের শিষ্য শ্রীমৎ ভক্তিতীর্থ স্বামী মহারাজ এই ধরাধাম ত্যাগ করে নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হলেন। দেহাবসান কালে তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৫৫ বৎসর। তিনি গত এক বৎসর যাবৎ মেলানোমা ক্যান্সার রোগে অসুস্থ ছিলেন। ১৯৭২ সালে আমেরিকার প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মনস্তত্ব' নিয়ে সফলতার সঙ্গে স্নাতোকত্তর ডিগ্রী লাভ করার পর, শ্রীল প্রভুপাদের 'ভগবদগীতা যথাযথ' গ্রন্থখানি পাঠ করে শ্রীল প্রভুপাদ ও কৃষ্ণভাবনামৃতের দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ঐ বৎসরই শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বহু গ্রন্থের প্রনেতা। তাঁর 'স্পিরিচুয়াল ওয়ারিয়র' গ্রন্থটি বিদ্ধ সমাজে সমাধিক সমাদর লাভ করে। ১৯৯০ সালে নাইজিরিয়া সরকার তাঁকে সে দেশের সর্ব্বোচ্চ সম্মান 'হাই চীফ ইন ওয়ারী' প্রদান করেন। তিনি ছিলেন আমেরিকান ফেডারেশন অব বৈষ্ণব কলেজ এন্ড স্কুলের ডিরেক্টর।

আলফ্রেড ফোর্ড কর্তৃক মায়াপুরে তিনটি প্রকল্পে অর্থ সংস্থান

মায়াপুরে ত্রি-স্তরীয় এক বিশাল প্রকল্পে আমেরিকার বিখ্যাত ধন কুবের হেনরী ফোর্ডের নাতি আলফ্রেড ব্রুশ ফোর্ডের সংস্থা এ বি এফ ইন্টারন্যাশনাল ২৮৩ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। সম্প্রতি কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ বি এফ ইন্টারশ্যাশনালের ডিরেক্টর জন রবার্ট এ কথা জানালেন। ফোর্ডের কোম্পানীর সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যালিস্টার টেলর জানান প্রস্তাবিত প্রকল্প তিনটির মধ্যে রয়েছে নদীয়ার মায়াপুরে একটি গ্রামীন শিল্প পার্ক গড়ে তোলা, পর্যটকদের জন্য উপযুক্ত হোটেল নির্মাণ এবং একটি বৈদিক তারামণ্ডল নির্মাণ। এই প্রকল্পগুলির জন্য মায়াপুরে ৬০ একর পরিমাণ জমির প্রয়োজন হবে। এই তিনটি প্রকল্পে ১৫ হাজার মানুষের কাজের সংস্থান হবে। এবং প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ হলে মায়াপুরে বৎসরে আরও ৩০ লক্ষ পর্যটকের আগমন ঘটবে। আগামী ২০০৯ সনের মধ্যে প্রকল্পগুলির কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে অ্যালিস্টার টেলর আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখযোগ্য এই যে এই এ বি এফ ইন্টারন্যাশনলের কর্ণধার আলফ্রেড ব্রুশ ফোর্ড ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অন্যতম এক দীক্ষিত শিষ্য। তাঁর দীক্ষিত নাম শ্রী অম্বরীশ দাস।

লুধিয়ানায় জন্মাষ্টমী উৎসব

গত ২৭শে আগষ্ট লুধিয়ানা ইসকন মন্দিরে পরমেশ্বর ভগবান শ্রী কৃষ্ণের শুভ আবির্ভাব তিথি-জন্মাষ্টমী মহাসমারোহে উদযাপিত হল। এ বৎসরও প্রায় ত্রিশ হাজার দর্শনার্থীর সমাগম হয়েছিল। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি লুধিয়ানা দুরদর্শনের এম এইচ ওয়ান চ্যানেলে সম্প্রচারিত করা হয়েছিল। সন্ধ্যা ৭টায় মুম্বাই থেকে আগত শ্রীপাদ জীব প্রভু এবং শ্রীমতী শিল্পীকর্ণি রাধা দাসী মাতাজী কীর্তন পরিবেশন করছিলেন। রাত ঠিক ১২টায় মন্দিরের ভক্তবৃন্দ দ্বারা শ্রীশ্রী নাড়ু গোপাল বিগ্রহের মহা অভিষেক অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষে রাত একটায় ভক্ত ও উপস্থিত দর্শনার্থীদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে উৎসবের সমাপ্তি হয়।

খাগড়াপুরে জন্মাষ্টমী পালিত

"আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ" (ইস্‌কন) কর্তৃক অনুমোদিত "শ্রীশ্রী হরেকৃষ্ণ নামহট্ট সংঘ" এর উদ্যোগে "রথযাত্রা উৎসব ২০০৫ইং" গত ৮ই জুলাই, রোজ শুক্রবার মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। ঐদিন বিকেলে ৪ টার সময় শ্রী জগন্নাথ, বলদেব, শুভদ্রাদেবী "পূর্ণরথের" বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে খাগড়াপুর শ্রী নামহট্ট মন্দির হতে বাজারের শাপলা চত্বর হয়ে শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির এ-(মাসীর বাড়ী হিসেবে) বেড়াতে যান। এতে শতশত স্বধর্ম প্রাণ নরনারীগণ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে (শ্রী জগন্নাথ, বলদেব, শুভদ্রাদেবী) অবস্থান কালে আট দিনব্যাপী প্রতিদিন বিভিন্ন আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গত ১৬ই-জুলাই রোজ শনিবারে আবার একইভাবে "পূনঃ উল্টোরথের" বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে খাগড়াপুর "শ্রী হরেকৃষ্ণ নামহট্ট মন্দিরে" এসে "রথাযাত্রা" উৎসবের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

আটদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানমালায় ছিল যথাক্রমে-মঙ্গলারতি, দর্শনারতি, গুরুপূজা, রাজভোগারতি, ভজন কীর্ত্তণ, ভাগবতপাঠ ও মহাপ্রসাদ বিতরণ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রী রূপেশ্বর কৃষ্ণদাসাধিকারী (নামহট্ট প্রচারক, ওমান) ও খাগড়াছড়ি নামহট্ট সংঘের সকল ভক্তবৃন্দ। আটদিন ব্যাপী শ্রী জগন্নাথ দেবের প্রতিদিন রাজভোগ ও মহাপ্রসাদ বিতরণে আর্থিক সহযোগীতা করেন-মিসেস অন্ধারাণী ত্রিপুরা, বাবু বীরেন্দ্র দেবনাথ, বাবু স্বপন দেবনাথ, বাবু শিব শংকর দেব, বাবু দুলাল বনিক (ধনা), বাবু দীপক চৌধুরী, বাবু নির্মল দেব, বাবু সুশীল বিশ্বাস, বাবু বাবুল দেব ও সনাতন ছাত্র যুব পরিষদ।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন শ্রীশ্রী হরেকৃষ্ণ নামহট্ট সংঘ, খাগড়াছড়ি ও শ্রীশ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির, খাগড়াছড়ি। অনুষ্ঠান শেষে শ্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরার সভাপতিত্বে (উল্টো রথের দিনে) শ্রী লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দিরে একটি সংক্ষিপ্ত ধর্মীয় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভা পরিচালনা ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন অত্র নামহট্ট মন্দিরের পরিচালনা কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রী কৃষ্ণদাস ত্রিপুরা এবং ইস্‌কনের বিভিন্ন দিক দর্শন সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখ্যা দিয়ে আলোচনা করেন শ্রী রূপেশ্বর কৃষ্ণদাসাধিকারী প্রমূখ। সবশেষে শ্রী নামহট্ট কর্তৃক আয়েজিত "রথযাত্রা" উৎসবের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আরো বক্তব্য রাখেন শ্রী আশীষ ভট্টাচার্য্য- সাধারণ সম্পাদক।
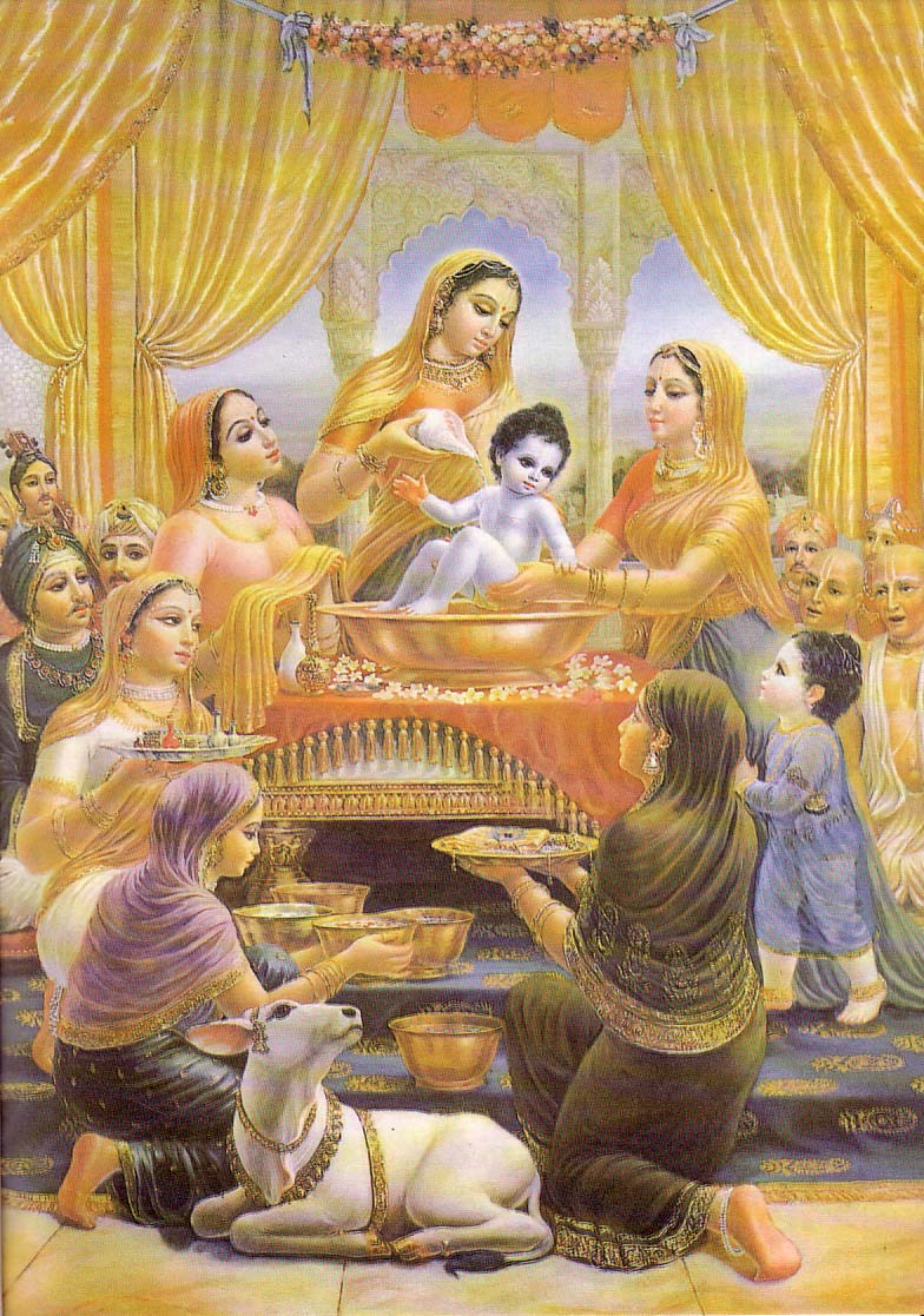
শ্রীশ্রী জগন্নাথদেবের
রথযাত্রা উৎসব '০৫
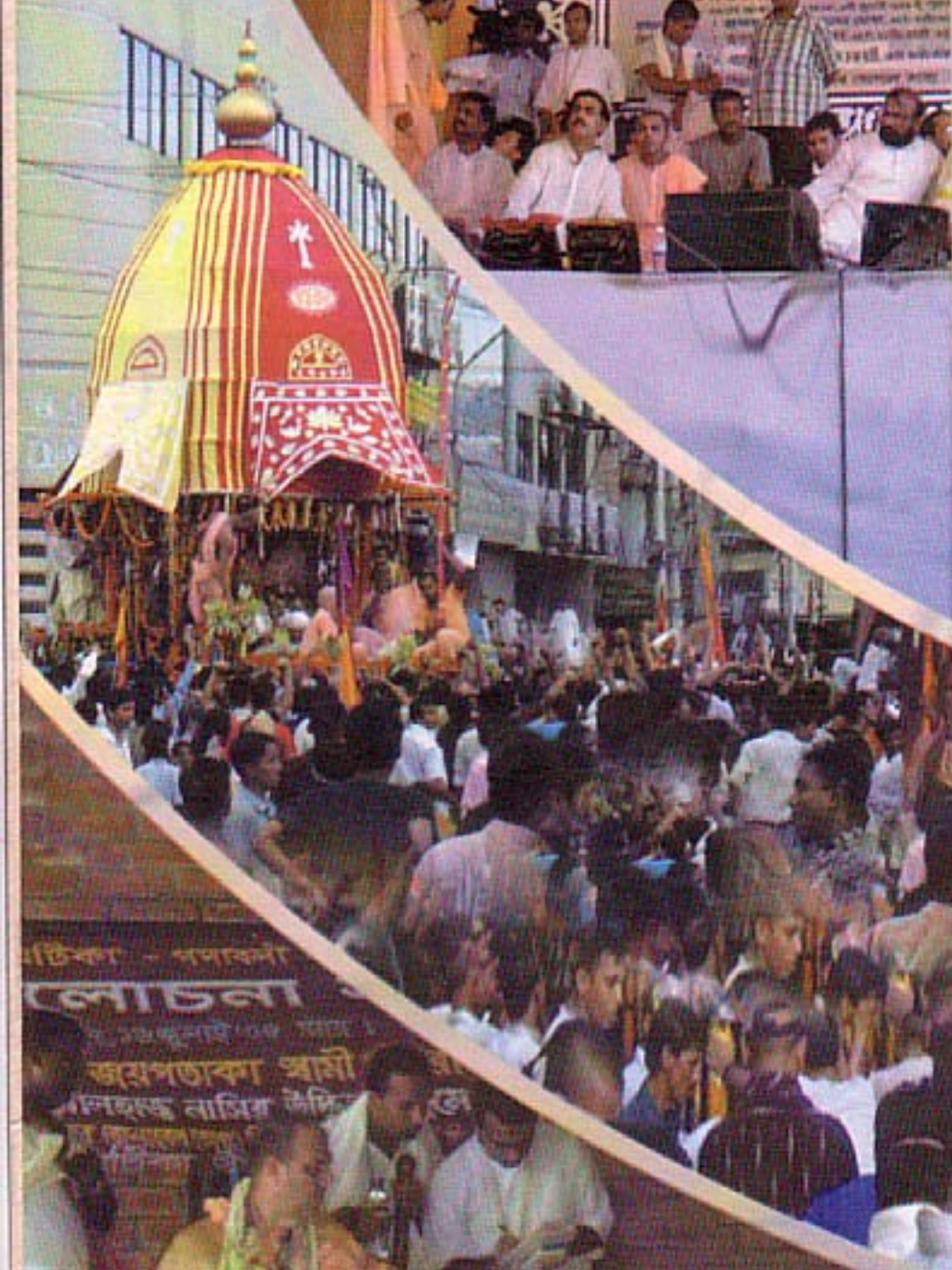
পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের
জন্মাষ্টমী উৎসব '০৫
আলোচনা সভা
আলোচনা সভা
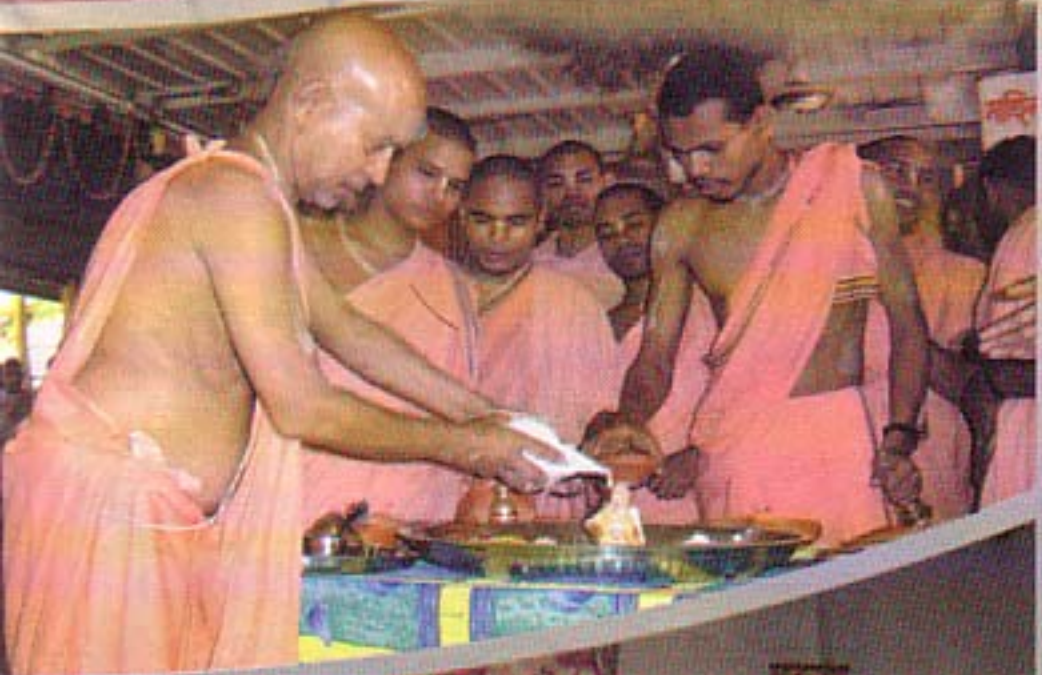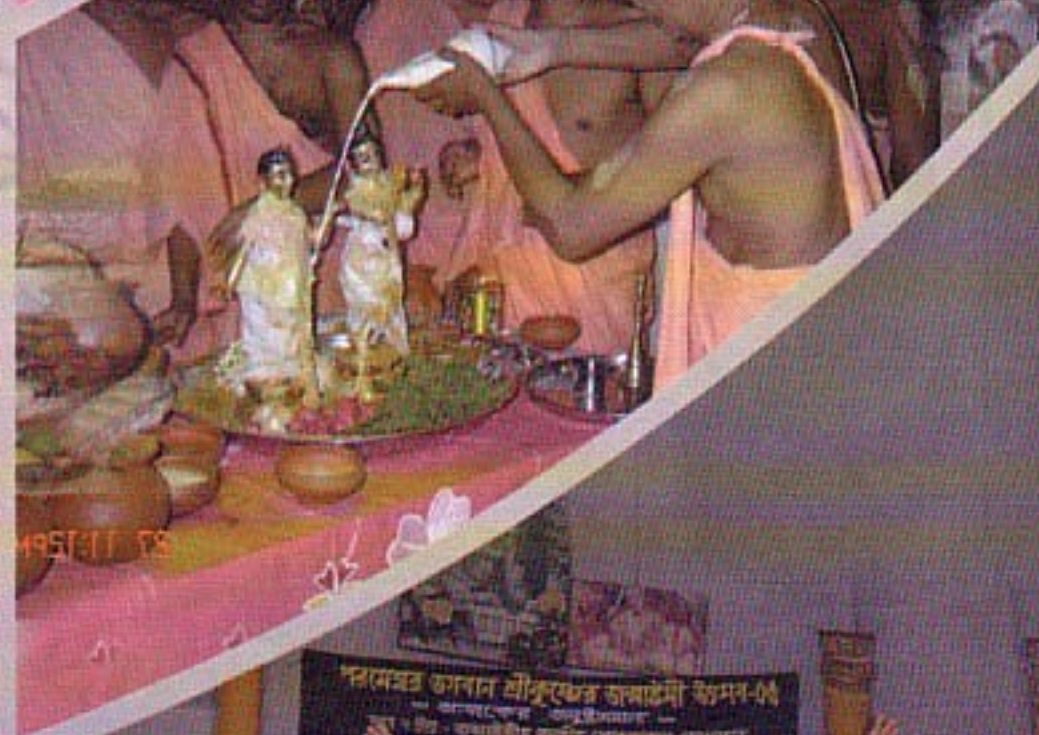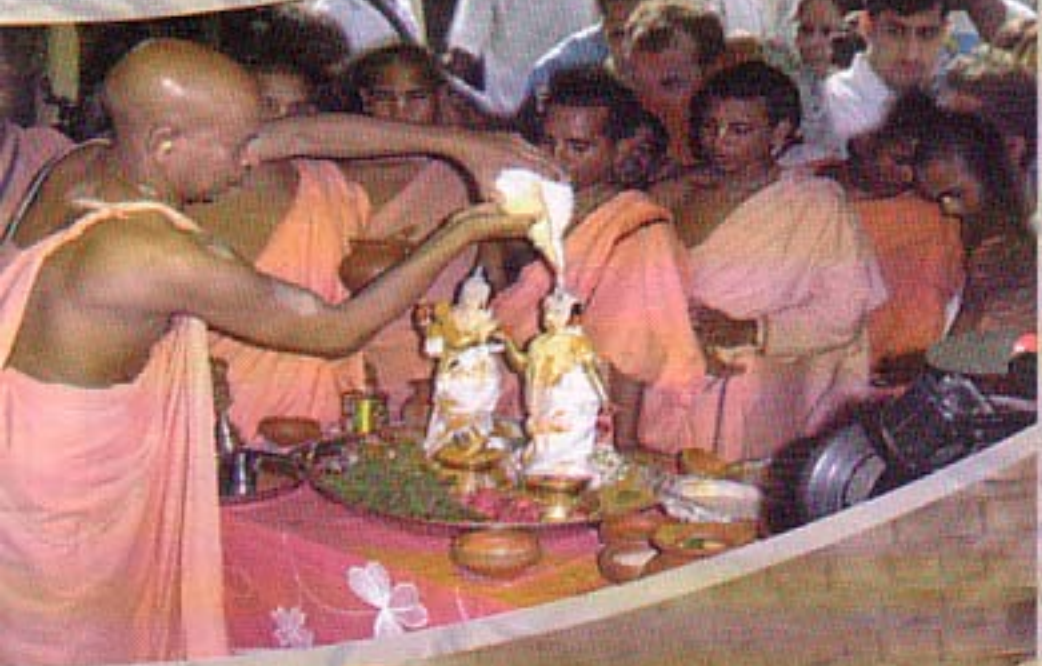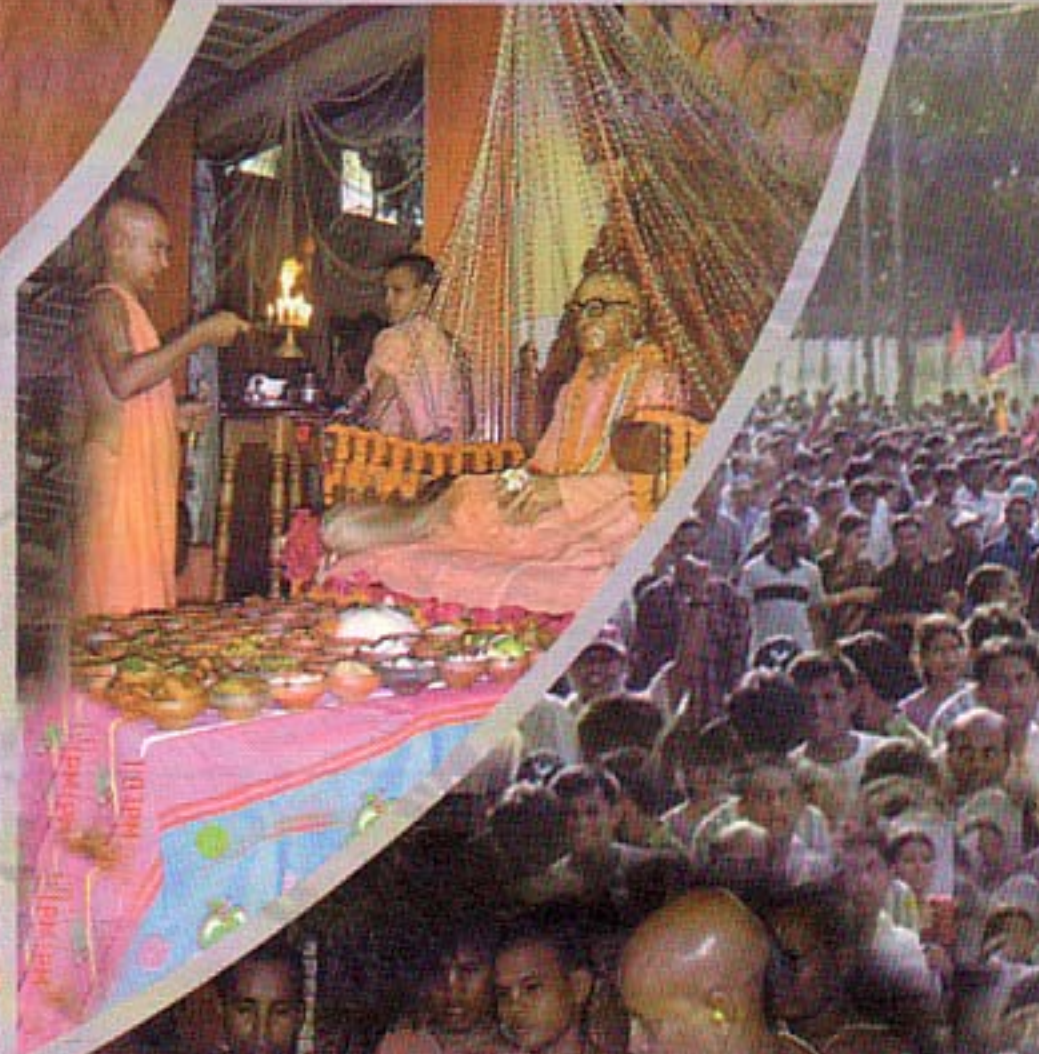
নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট শ্রীমৎ ভক্তিতীর্থ স্বামী মহারাজ
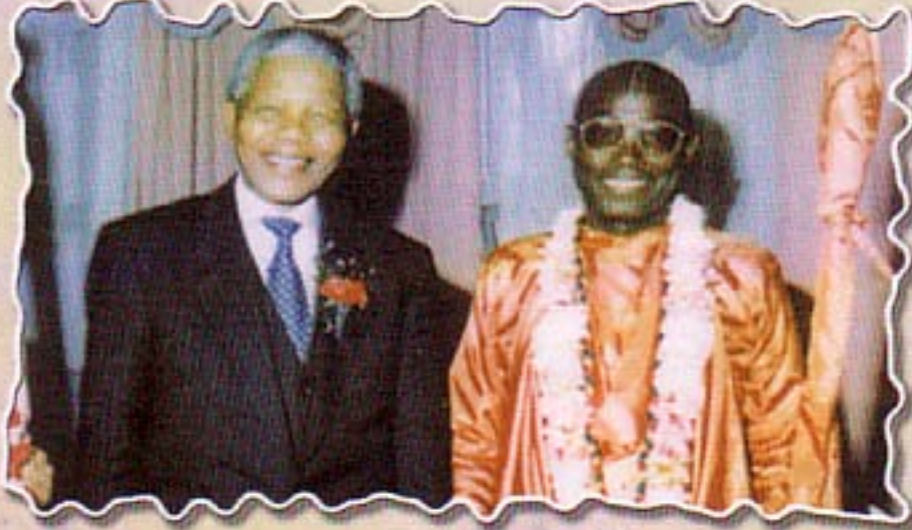
নেলসন ম্যান্ডেলার সাথে শ্রীমৎ ভক্তিতীর্থ স্বামী মহারাজ

সংকীর্তনরত শ্রীমৎ ভক্তিতীর্থ স্বামী মহারাজ

চট্টগ্রামের রথযাত্রায় বিবিধ অনুষ্ঠানমালা

ঢাকার ওয়ারী মন্দিরের জন্মাষ্টমীতে নৃত্যানুষ্ঠান

বরিশালের রথযাত্রা অনুষ্ঠান

নন্দোৎসব

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

যদিও কৃষ্ণ ছিলেন দেবকী এবং বসুদেবের পুত্র, কংসের অত্যাচারের ফলে বসুদেব কৃষ্ণের জন্মোৎসবের আনন্দ উপভোগ করতে পারেন নি। কিন্তু কৃষ্ণের পালক-পিতা নন্দ মহারাজ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে কৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করেছিলেন। পরের দিন ঘোষণা করা হয়েছিল যে, যশোদার একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। বৈদিক প্রথা অনুসারে নন্দ মহারাজ জ্যোতিষী এবং ব্রাহ্মণদের জন্মোৎসব পালন করার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। শিশুর জন্মের পরে জ্যোতিষীরা তাঁর জন্মলগ্নের গণনা ক'রে কোষ্ঠী তৈরী করলেন।

শিশুর জন্মের পরে আর একটি অনুষ্ঠান পালন করা হয়; পরিবারের সকলে স্নান ক'রে পবিত্র হ'য়ে নানা অলঙ্কার এবং মালায় ভূষিত হ'য়ে, জ্যোতিষীর কাছ থেকে শিশুটির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অবগত হন। নন্দ মহারাজ সহ পরিবারের সমস্ত সদস্যরা সুন্দর বসন-ভূষণে সজ্জিত হ'য়ে শিশুটির সামনে বসলেন। সমস্ত বৈদিক ব্রাহ্মণেরা নানারকম মঙ্গলসূচক মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন এবং জ্যোতিষ-আচার্যরা শিশুটির জন্মগত সংস্কার সম্পন্ন করলেন এবং এই অনুষ্ঠানে স্বর্গের সমস্ত দেবতাসহ পিতৃপুরুষেরাও পূজিত হন। নন্দ মহারাজ, প্রসন্নতা সহকারে ব্রাহ্মণদের ২,০০,০০০ গাভী দান করলেন এবং সেই সমস্ত গাভীগুলি সুন্দর বস্ত্র এবং অলঙ্কারে ভূষিত ছিল। তিনি কেবল গাভীই দান করলেন না, স্বর্ণ-খচিত বস্ত্র অলঙ্কার এবং পর্বত প্রমান শস্যও দান করলেন।

এই জড় জগতে আমরা নানাভাবে ধনসম্পদ সংগ্রহ করি, কিন্তু সবসময় সেই ধনসম্পদ সৎ-ভাবে বা সম্পূর্ণ কলুষ-মুক্ত ভাবে অর্জন করা হয় না বা অর্থ-উপার্জন করতে গেলে নানাভাবে নানারকম পাপ হ'য়ে যায়। তাই বৈদিক প্রথা অনুসারে সেই সম্পদের পবিত্রীকরণ করা হয় ব্রাহ্মণদের গরু এবং সোনা দান করার মাধ্যমে। ব্রাহ্মণদের শস্য দান করার মাধ্যমে নবজাত শিশুটির পবিত্রীকরণ হ'ল। আমাদের বুঝতে হবে যে, এই জড় জগতে আমরা সব সময়ই কলুষিত অবস্থায় রয়েছি। তাই আমাদের আয়ু, আমাদের ধনসম্পদ এবং আমাদের আত্মাকে পবিত্র করতে সচেষ্ট হ'তে হয়। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে স্নান করার মাধ্যমে, শরীরের বাহ্য এবং অভ্যন্তর পরিষ্কার করার মাধ্যমে, এবং দশ রকমের সংস্কার পালন করার মাধ্যমে নিজেকে পবিত্র করতে হয়। ধন-সম্পদের শুদ্ধিকরণ হয় তপস্যা, পূজা এবং দানের মাধ্যমে। বেদাধ্যয়ন, আত্মোপলব্ধি এবং পরমাত্মা চিন্তনের মাধ্যমে আত্মার পবিত্রীকরণ হয়। তাই বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, জন্ম অনুসারে সকলেই শূদ্র কিন্তু সংস্কারের মাধ্যমে মানুষ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। বেদ অধ্যয়নের মাধ্যমে বিপ্রত্ব লাভ হয়, যা হচ্ছে ব্রাহ্মণ হওয়ার প্রাথমিক গুণাবলী। যখন পূর্ণরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় তখন তাকে ব্রাহ্মণ বলা হয়। আর ব্রাহ্মণ যখন সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়স্তরে অধিষ্ঠিত হ'ন তখন তাঁকে বৈষ্ণব বা ভক্ত বলা হয়।

সেই উৎসবে সমবেত সমস্ত ব্রাহ্মণেরা নবজাত শিশুটির সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা ক'রে নানারকমের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের নানা রকম পন্থা আছে, তাদের নাম হচ্ছে সূত, মাগধ, ও বিরুদাবলী। সেই মন্ত্র ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ঢাক এবং শিঙা বাজতে লাগল। সেই সময় সমস্ত গোচারণভূমি জুড়ে এবং সমস্ত বাড়ীতে সেই আনন্দধ্বনি স্পন্দিত হ'তে লাগল। প্রতিটি বাড়ীর ভিতরে এবং বাইরে চালের গুড়ো দিয়ে আলপনা আঁকা হয়েছিল, আর সর্বত্র এমন কি রাস্তাঘাটেও সুবাসিত জল ছেটানো হয়েছিল। বাড়ীর ছাদে নানারকম পতাকা, ঝালর এবং বৃক্ষপল্লব শোভা পাচ্ছিল। সবুজ পল্লব আর পুষ্প দিয়ে দ্বার নির্মাণ করা হয়েছিল। সমস্ত গরু, বাছুর এবং ষাঁড়দের শরীর তেল আর হলুদ দিয়ে মালিশ করা হয়েছিল এবং নানারকম রং দিয়ে তাদের গায়ে সুন্দর সুন্দর নকশা আঁকা হয়েছিল। ময়ূরের পালক দিয়ে মালা তৈরী করে তাদের গলায় পরানো হয়েছিল, তাদের গায়ে ছিল খুব সুন্দর সুন্দর পোশাক আর তাদের গলায় ঝুলছিল সোনার হার।

সমস্ত গোপ-গোপীরা যখন শুনলেন যে, নন্দ মহারাজ তাঁর সন্তানের জন্মোৎসব পালন করছেন, তখন তাঁরা আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেন। তাঁরা অত্যন্ত মূল্যবান বস্ত্র এবং অলঙ্কারে ভূষিত হলেন এবং মাথায় খুব সুন্দর বড় পাগড়ি বাঁধলেন। এইভাবে ভূষিত হ'য়ে তাঁরা নানারকম উপহার নিয়ে নন্দ মহারাজের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

পদ্মের রেণু যেমন পদ্মের অপূর্ব সৌন্দর্য প্রদর্শন করে, ঠিক তেমনই গোপীকাদের পদ্মের মত সুন্দর মুখমন্ডল কুমকুমের রেণু দিয়ে ভূষিত হয়েছিল। এই অপূর্ব সুন্দরী গোপীকারা তাঁদের উপহার নিয়ে অতি শীঘ্র নন্দ মহারাজের গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। তাদের গুরু-নিতম্ব এবং স্থূল কুঁচযুগলের ভারে তাঁরা দ্রুতগতিতে চলতে পারছিলেন না। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমে উৎফুল্ল হ'য়ে তাঁরা যত শীঘ্র সম্ভব নন্দ মহারাজের বাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'তে লাগলেন। তাঁদের কানে মুক্তার দুল শোভা পাচ্ছিল, তাঁদের রক্তিম অধরোষ্ঠ তাম্বুলের রাগে আরও রক্তিম হ'য়ে উঠেছিল, তাঁদের ভ্রমর-কৃষ্ণ চোখ ছিল কাজলের কালো রেখায় রঞ্জিত, আর তাঁদের হাতে নানারকমের চুড়ি-বালা শোভা পাচ্ছিল। যখন তারা ত্বরিতগতিতে পাথরের রাস্তার ওপর দিয়ে যাচ্ছিল, তখন

তাঁদের অঙ্গের ফুলমালা থেকে ফুলগুলি ঝরে পড়ছিল এবং মনে হচ্ছিল যেন স্বর্গ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে। তাঁদের অঙ্গের বিভিন্ন আভরণের আন্দোলনের ফলে তাঁদের আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল। এইভাবে তাঁরা সকলে নন্দ-যশোদার গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন, এবং শিশুটিকে আশীর্বাদ ক'রে বললেন, "প্রিয় শিশু, আমাদের রক্ষা করবার জন্য তুমি দীর্ঘজীবী হও।" এইভাবে তাঁরা যখন শিশুটিকে আশীর্বাদ করছিলেন, তখন তাঁরা তেল, হলুদের গুঁড়ো, দই, দুধ আর জল একত্রে মিশ্রিত ক'রে তা সিঞ্চন করছিলেন, এবং কৃষ্ণের শরীরেই তাঁরা শুধু তা সিঞ্চন করলেন না, সেখানে উপস্থিত সকলের শরীরেই তাঁরা তা সিঞ্চন করতে শুরু করলেন। সেই মঙ্গল অনুষ্ঠানে সুদক্ষ বাদক বাজনা বাজাচ্ছিল।

গোপেরা যখন গোপীকাদের এই লীলা দর্শন করলেন তখন তাঁরা অত্যন্ত উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেন এবং তাঁরাও দই, দুধ, ঘি এবং জল গোপীকাদের শরীরে ছুঁড়তে লাগলেন। তারপর উভয় পক্ষই একে অপরের দিকে মাখন ছুঁড়তে লাগলেন। গোপ এবং গোপীকাদের এই লীলা দর্শন ক'রে নন্দ মহারাজও অত্যন্ত উৎফুল্ল হলেন। এবং মুক্তহস্তে তিনি উপস্থিত সকল সঙ্গীতজ্ঞ এবং বাদ্যকারদের দান করতে লাগলেন। অনেক গায়কেরা উপনিষদ এবং পুরাণ থেকে স্তব করছিলেন, কেউ কেউ নন্দ মহারাজের বংশাবলীর কীর্তিগান করছিলেন, আর কেউ কেউ অতি মধুর স্বরে গান গাইছিলেন। সেখানে অনেক বিদ্বান ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন এবং আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে, নন্দ মহারাজ তাঁদের নানারকম বস্ত্র, অলঙ্কার এবং গাভী দান করতে লাগলেন।

এই উপলক্ষে এখানে আমরা দেখতে পাই যে, কেবল গো-পালন ক'রে বৃন্দাবনবাসীরা কত সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। সমস্ত গোপেরা ছিলেন বৈশ্য, এবং তাঁদের বৃত্তি ছিল কৃষি এবং গো-রক্ষা। তাঁদের বেশভূষা, অলঙ্কার এবং আচরণ থেকে বোঝা যায় যে, যদিও তাঁরা একটা ছোট্ট গ্রামে ছিলেন, কিন্তু তবুও জড়জাগতিক মাপকাঠিতেও তাদের জীবনযাত্রার মান কত উন্নত ছিল। তাঁরা অত্যন্ত ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। তাঁদের কাছে এত দুধ, দই ছিল যে, তাঁরা একে অপরের গায়ে অপর্যাপ্ত মাত্রায় দই-মাখন ছোঁড়াছুঁড়ি করছিলেন। তাঁদের ঐশ্বর্য ছিল দুধ, দই, ঘি, মাখন এবং অন্যান্য সমস্ত দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং কৃষিজাত দ্রব্য। সেসবের বিনিময়ে তাঁরা নানারকমের মণিমাণিক্য, অলঙ্কার এবং মূল্যবান সাজ পোশাকে সুসজ্জিত ছিলেন। তাঁদের কাছে কেবল এই সম্পত্তিই ছিল না, উপরন্তু নন্দ মহারাজের মত তাঁরা সে সমস্ত সম্পত্তি দানও করতেন।

এইভাবে শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা নন্দ মহারাজ সেখানে সমবেত সকলেরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে লাগলেন। তিনি তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে কামনা অনুসারে তাঁদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে লাগলেন। বিদ্বান ব্রাহ্মণেরা তাঁদের জীবনধারণের জন্য কেবল বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়দের উপর নির্ভর করতেন। জন্মোৎসব, বিবাহোৎসব আদি উৎসবে তাঁরা দান গ্রহণ করতেন। নন্দ মহারাজ যখন এই মহোৎসব উপলক্ষ্যে বিষ্ণুর আরাধনা করছিলেন এবং উপস্থিত সকলকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করছিলেন, তাঁর একমাত্র বাসনা ছিল যে, নবজাত কৃষ্ণ যেন সুখী হয়। নন্দ মহারাজের কোন ধারণাই ছিল না যে, এই শিশুটিই হচ্ছেন বিষ্ণু, কিন্তু তিনি বিষ্ণুর কাছে তাঁকে রক্ষা করার জন্য প্রার্থনা করছিলেন।

বলরামের মাতা রোহিণী দেবী ছিলেন বসুদেবের সবচাইতে সৌভাগ্যবতী-পত্নী। তিনি বসুদেবের থেকে দূরে ছিলেন, কিন্তু তবুও কৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে নন্দ মহারাজকে অভিনন্দন জানাবার জন্য অত্যন্ত সুন্দর সজ্জায় ভূষিত হলেন। ফুলের মালা, কণ্ঠহার এবং মণি-মাণিক্য খচিত নানারকম অলঙ্কারে ভূষিত হ'য়ে তিনি সেখানে উপস্থিত হলেন এবং তিনি ঘুরে ফিরে অতিথিদের তত্ত্বাবধান করতে লাগলেন। বৈদিক রীতি অনুসারে পতি যখন গৃহে থাকেন না, তখন পত্নী অঙ্গরাগ করেন না। কিন্তু যদিও রোহিণীর পতি বসুদেব সেখানে ছিলেন না, তবুও কৃষ্ণের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে তিনি অঙ্গরাগ করেছিলেন।

কৃষ্ণের জন্মোৎসবের ঐশ্বর্য দেখে সহজেই বুঝতে পারা যায় যে, তখন বৃন্দাবন সবরকম ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ছিল। যেহেতু কৃষ্ণ নন্দ মহারাজ এবং যশোদা মায়ের গৃহে অবতরণ করেছিলেন, তাই লক্ষ্মী বৃন্দাবনে সমস্ত ঐশ্বর্য প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, বৃন্দাবন লক্ষ্মীদেবীর লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল।

 কৃপা করি' যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার। আপন-কৃপাতে কহ 'কর্তব্য' আমার॥

বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে

এই যুগের সমস্যাদির পারমার্থিক পর্যালোচনা

–শ্রীঅশ্বিনী কুমার সরকার

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পশুবলির সপক্ষে সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতির অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর উক্তি কি গ্রহণযোগ্য ?

(প্রথম পর্ব)

সনাতন ধর্মাবলম্বী জনগণ গৌতম বুদ্ধকে ঈশ্বরের অবতার হিসেবে মান্য করে। গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত ধর্মের মূলমন্ত্রই ছিল 'অহিংসা পরম ধর্ম, প্রাণিহত্যা মহাপাপ'। মহাত্মা গান্ধী রাজনীতিক হলেও বুদ্ধের এ নীতিবাক্য অক্ষরে অক্ষরে মান্য করেছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম হলেও তাঁর 'ধর্মমোহ' কবিতায় ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পশুবলির (রক্তপাতের) বিরোধিতা করেছেন অত্যন্ত জোরালো ভাষায়। ইস্‌কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাঁর হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের মাধ্যমে বস্তুত বৈদিকী অহিংসবাদই প্রচার করে গেছেন। তিনি বলেছেন, "কৃষ্ণভক্ত-তা যে দেশেরই হোক না কেন, চলবে না তার আমিষ (মাছ-মাংস) আহার।" প্রাণী হত্যা ব্যতীত মাছ-মাংস আহার সম্ভব নয়। তাই ইস্‌কন সবসময়ই জনগণকে নিরামিষ ভোজনে উৎসাহিত করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি (সমাজ দর্পণের বর্তমান সম্পাদক) শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবর্তী মহোদয় নিজেকে ইস্‌কনের আজীবন সদস্য বলে দাবি করলেও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পশুবলি (প্রাণিহত্যা) প্রশ্নে দেখা যায় ইস্‌কনের অবস্থানের পুরোপুরি বিপক্ষে। এ বিষয়টি স্পষ্ট হয় তার দেয়া বক্তব্যের মাধ্যমেই। সমাজ দর্পণ জ্যৈষ্ঠ-১৪১১ সংখ্যার প্রশ্নোত্তর পাতায় তার কাছে জানতে চাওয়া হয় "হিন্দুদের বলিপূজা করে লাভ কী ? বলি পূজা কেন করা হয় ? এর কারণ কী ?" উত্তরে তিনি বলেছেন,"এটা বলি পূজা নয়। পূজায় বলি দেয়া। বলি শব্দের অর্থ ত্যাগ। আমাদের মধ্যে অনেক পশুবৃত্তি আছে। দেব-দেবীর সামনে ঐ পশুবৃত্তি ত্যাগই বলি। আমরা নিজের পশুবৃত্তি রক্ষা করতে বনের পশুকে বলি দেই। আবার এমন পশু দিই-যাকে সহজে ধরা যায় এবং যার মাংস খাওয়া যায়।' "নিজের পশুবৃত্তি রক্ষা করতে বনের পশুকে বলি দিই"- এ উক্তি কেবল বিভ্রান্তিকর নয়, রীতিমতো আপত্তিকরও। আর মাংস খাওয়ার জন্য বলি'- এ উক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। মাংস খাওয়ার জন্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বলি দেয়ার কী প্রয়োজন ? উত্তরের সপক্ষে যথেষ্ট শাস্ত্রীয় যুক্তি-প্রমাণ থাকা প্রয়োজন। কিন্তু তিনি তো কোন প্রমাণ উপস্থাপন করেননি। 'পশুবৃত্তি ত্যাগ-বলি' হলেও সেজন্য পশুহত্যার কি কোন প্রয়োজন আছে ? মনের পশুবৃত্তির সাথে বনের কিংবা গৃহপালিত পশুর জীবন ও রক্তের কী সম্পর্ক ? মনের পশু বধ করা যেতে পারে সংযম ও জ্ঞানরূপ খড়গ দ্বারা কিংবা নিজের রক্ত উৎসর্গ করে। ধর্মবিশ্বাসীদের উপলব্ধি করতে হবে যে, মানবহৃদয়ও একটা মন্দির। সেখানেও জ্ঞানরূপ খড়গ শানিত হয় এবং শত সহস্র পাশব প্রবৃত্তি তথা কুরিপুসমূহের বলি হয় প্রতিদিন। কুরিপুর 'বলি' জ্ঞানশক্তি বলে চালিত ইচ্ছা ও সংযমের মাধ্যমে হতে পারে। এজন্য প্রাণী হত্যার কোন প্রয়োজন পড়ে না। পাঠা কামের প্রতীক; আর মহিষ ক্রোধের প্রতীক। সুতরাং 'বলি' ব্যাপারটি প্রতীকী। 'বলি প্রথা' বহাল রাখার পক্ষে এ ধরনের ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। যে প্রথায় বাস্তবে প্রাণীর জীবন সংহার হচ্ছে, তা প্রতীকী হয় কী করে ? প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোন জড় পদার্থ; যেমন জড় প্রতিমা একটি প্রতীক। বলি ব্যাপারটি প্রতীকী বলে গণ্য করলে এ উদ্দেশ্যে জড় কোন পদার্থ (বড়জোর নিজ রক্ত) ব্যবহৃত হওয়া কি সমীচীন নয় ? এ প্রশ্ন সবার মনেই জাগা স্বাভাবিক। কিন্তু এ বিষয়টা তো পুরোপুরি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। অধিকন্তু বলি প্রশ্নে টেনে আনা হয়েছে মাংস খাওয়ার প্রসঙ্গ। তার এ উক্তির মাধ্যমে প্রলোভনভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। লোভ হচ্ছে একটা প্রধান কুরিপু, যা নরকের দ্বারস্বরূপ। বৈদিক শাস্ত্রে একথা স্পষ্টভাবেই উল্লেখ রয়েছে। তাই এখানে প্রশ্ন তোলা যায়, মানুষকে নরকের দরজার দিকে টেনে নেয়া কোন দৈবীভাবসম্পন্ন মানুষের কাজ হতে পারে ? আসুরিক স্বভাবসম্পন্ন লোকেরাই সাধারণত এ কাজ করে থাকে ; যেহেতু তাদের কাছে অধর্ম ধর্ম বলে প্রতিভাত হয়। তাই দৈবীভাবাপন্ন মানুষের কাছে 'বলি' প্রশ্নে তার দেয়া উত্তর মোটেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। আমার মতে তার উত্তর অস্পষ্ট, বিভ্রান্তিকর অথবা মনগড়া। সনাতন ধর্মের মূল ধারার সাথে তার উত্তর মোটেই সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিতও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পশুবলির সমর্থক। ওই মন্দিরেই পশুবলির ব্যবস্থা আছে। পশুবলির ব্যবস্থা আছে ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরেও- ঢাকেশ্বরী ও সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের পুরোহিতদ্বয় সম্ভবত বলবেন, পশুবলি প্রদান করা সনাতন ধর্মবলম্বী সমাজের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য। তাই ওটা পরিত্যাগ করা যায় না। অবশ্য একথা আসামের কামাখ্যাতীর্থ মন্দিরের পুরোহিতও বলেন। আসলে মন্দিরে প্রাণিহত্যা বহাল রাখা ও মাংস খাওয়ার পক্ষে এটা একটি খোঁড়া যুক্তি। প্রাচীনকাল থেকে

 শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত' পাষণ্ড। অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড॥

চলে আসলেই কোন রীতি বিচার-বিবেচনা ছাড়া নিষ্ঠার সাথে মেনে চলতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা ধর্মে আছে কি ? ধর্মের মূল চেতনার সাথে যা সঙ্গতিপূর্ণ নয় তা কি বাদ দেয়া যায় না ? উল্লেখ্য, অসংখ্য মঠ, মন্দির, ধাম আছে-যেখানে এখন আর কোন পশুবলি হয় না। পাপকর্ম বলে বুঝতে পেরে অনেকেই তা বাদ দিয়েছেন। এখনও যারা পশুবলির সমর্থক, তাদের উদ্দেশ্যে বলা যায় কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে নরবলির কথাও উল্লেখ আছে। একসময় নরবলি প্রদান করতো অজ্ঞ, অসুর কিংবা দানব (হিংসা) প্রকৃতির লোকেরা। কেবল ভারতবর্ষে নয় ; মিসর ও আরবীয় অঞ্চলেও একসময় এ প্রথার প্রচলন ছিল। বাংলাভাষাভাষী অঞ্চলেও যে একসময় এ প্রথার প্রচলন ছিল তার একটি প্রমাণ বিজ্ঞ পাঠকমন্ডলীর অবগতির জন্য এখানে আমি উপস্থাপন করতে পারি। প্রায় একশ' বছর আগে ঢাকার সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরেও নরবলি হতো। ড. আশরাফ সিদ্দিকী সাহেব ৮/০৫/১৯৯৩ তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠে "সিদ্ধেশ্বরী মন্দির" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে তা তুলে ধরেছিলেন। তিনি এ প্রমাণ সংগ্রহ করেছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী থেকে তার গবেষণার মাল-মসলা জোগার করতে গিয়ে। সেখানে সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের নরবলি সংক্রান্ত ভয়ঙ্কর তথ্যটি তিনি খুঁজে পান 'জার্নাল অব অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি অব বোম্বে' পত্রিকায়। পত্রিকার পাতা উল্টিয়ে সেই বিশেষ প্রতিবেদনটি খুঁজে পান-যার শিরোনাম 'নোট অব কেস অব হিউম্যান স্যাক্রিফাইস্ এ্যাট ঢাকা'। প্রবন্ধটির লেখক তদানীন্তন ঢাকারই এক ইংরেজ সিভিলিয়ান, যার নাম এস.এম. এডওয়ার্ডস। ড. আশরাফ সিদ্দিকী সে প্রতিবেদনের আলোকেই দৈনিক জনকণ্ঠে 'সিদ্ধেশ্বরী মন্দির' শির্ষক প্রবন্ধটি রচনা করেন। এখানে আমি সে প্রবন্ধ থেকেই উদ্ধৃতি তুলে ধরছি,-"ঢাকা সিটির একপ্রান্তে জঙ্গলাকীর্ণ পূর্বাঞ্চলে ঘন-সবুজ বট-অশ্বত্থ আর গাছ-গাছালীর নির্জনতায় আছে এক মন্দির-নাম সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। এ মন্দিরটি ঢাকেশ্বরী নামে যে ঐতিহাসিক মন্দির আছে শহরের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে-'পিলখানার দিক যেতে' তার চেয়েও প্রাচীন। ভয়াবহ এ মন্দিরের ইতিবৃত্ত; এখানে নরবলি হয়ে আসছে কয়েক শ' বছর ধরে। এখানে আছে এক কালীমন্দির-যা বহু প্রাচীন। অর্থশালী ব্যক্তিগণ কোন দৈব-দুর্বিপাক, নতুন গৃহের প্রতিষ্ঠা, নতুন দীঘি কিংবা জলাশয় খনন, সন্তান কামনা, কোন কঠিন রোগ নিরাময় বা দৈব-দুর্বিপাক এড়ানোর জন্য তান্ত্রিক সন্ন্যাসীদের নির্দেশে কেবল পাঁঠাবলি নয়, একসময় নরবলিও দিত। তাতে নাকি হতো ভক্তের অভিষ্ট সিদ্ধি। ছেলেধরা বা ছালাধরার দল চুরি করে নিয়ে আসতো অর্ডার মতো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে-দেশের নানা প্রান্ত থেকে- উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে মানত আদায়ের উপকরণ হিসেবে। বিশেষ মন্ত্রতন্ত্র, তুক্তাক্ এবং যাগযজ্ঞের পর একদিন গভীর নিশীথে ঘাতকের খড়্গের এক আঘাতে দ্বিখন্ডিত হ'ত সেই হতভাগ্য শিশুদের গর্দান। (তথ্যসূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং ৮.০৫.৯৩)

এখন ভারতের প্রসঙ্গে আসা যাক। ভারতের তামিল নাড়ু রাজ্যের একটি গ্রামে পাঁঠার বদলে নরবলির একটি ঘটনা ঘটে ১৯৯৪ সালে। এ কান্ড ঘটায় মন্দিরের পুরোহিত স্বয়ং। সিমা নেন্দাল গ্রামের একটি মন্দিরে ধর্মীয় উৎসব চলছিল। দেবতার অর্ঘ হিসেবে একটি পাঁঠা বলি দেয়া হবে-একথা জানতো গ্রামবাসীরা। এ দৃশ্য দেখতেই তারা সেদিন মন্দির প্রাঙ্গনে সমবেত হয়েছিল। কিন্তু যা দেখল তাতে আতঙ্ক ও বিভীষিকায় শিউরে উঠে তারা সবাই একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ভক্তরা চোখের সামনে দেখল পুরোহিত বিশাল এক খড়্গ তুলে নিল হাতে। মাথার ওপর তুলে ধরলো ওটাকে। তারপর সজোরে বসিয়ে দিল পাশে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনারত নিজের শ্যালক মারিমুথুর গর্দানে। চোখের পলকে ধর থেকে ছিটকে পড়ল তার মুন্ডু। সে এক বীভৎস ও লোমহর্ষক দৃশ্য। ভক্তরা সাধারণ সম্বিত ফিরে পাওয়ার আগেই পুরোহিত (নির্বিকারচিত্তে) পালিয়ে যেতে সমর্থ হয় সেখান থেকে। এখন পুলিশ তাকে খুঁজছে নরহত্যার অভিযোগে। (তথ্যসূত্রঃ দৈনিক জনকণ্ঠ, তাং ১৩.০৩.৯৪) ঘাতক, কসাই ও পশুহত্যাকারীরা স্বভাবতই অত্যন্ত নির্দয়, নির্মম, নিষ্ঠুর কিংবা হিংস্র প্রকৃতির হয়। প্রাণিহত্যা করতে করতে তাদের মায়া-মমতা বলতে গেলে একেবারে শূন্যের কোঠায় পৌঁছায়। অনেক সময় তারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্যও হয়ে যায়। তারা কেবল পশু-পাখি নয়, অবলীলায় নরহত্যাও করতে পারে। উপরোল্লিখিত লোমহর্ষক ঘটনা তো তারই একটি জ্বলন্ত প্রমাণ।

যারা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পশু বলি কিংবা জবাই প্রদান করে, তারা তা করে ধর্ম কিংবা পূণ্য সঞ্চয়ের আশায়। বলি প্রদান করা যে ধর্ম, তা ইহুদিরাও মনে করতো। রাজা শৌল (দায়ূদের পূর্ববর্তী) ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন না করে পশুবলি প্রদান করেছিলেন। এজন্য তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে প্রভুর চরম রোষানলে পতিত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে মহাত্মা শমূয়েলের উক্তিঃ "দেখ, বলি প্রদান করা অপেক্ষা আজ্ঞা পালন উত্তম এবং মেষের মেদ (রক্ত, মাংস, চর্বি) অপেক্ষা অবধান (শ্রবণ, মনন, পালন) করা উত্তম। তুমি সদাপ্রভুর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়াছ; আর এই জন্য তিনি তোমাকে অগ্রাহ্য করিয়া রাজ্যচ্যুত করিয়াছেন।" (তথ্যসূত্রঃ ঈশ্বরের অভিপ্রায়, পৃঃ ৯৪, ১ম শমূঃ ১৫ঃ ২২-২৩) ইহুদি ধর্ম আজ্ঞা তথা আদেশমূলক; দশটি আদেশ এর ভিত্তি। ষষ্ঠ আদেশে হত্যা না করার কথা বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা আছে যে, ঈশ্বর প্রাণবায়ু প্রদান করেন এবং কেবল তিনিই তা তুলে নিতে পারেন। অন্যদের সে অধিকার দেয়া হয়নি। তবে সমস্যা হল ইহুদিরা এ আদেশটি কেবল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে মনে করে। তারা বলে, পশু-পাখির ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। কিন্তু চতুর্থ আদেশে সৃষ্টিকর্তা যে পশু-পাখি তথা মূক জন্তুদের খোঁজ-খবর নেন, তাদের সুখ-শান্তি ও বিশ্রামের কথা ভাবেন তার স্পষ্ট উল্লেখ

রয়েছে। তিনি বলেছেন, "সপ্তমদিনে বিশ্রাম করিও এবং লক্ষ্য রাখিও তোমার গরু ও গর্দভও (গৃহপালিত পশু) যেন বিশ্রাম পায়।" উল্লেখ্য, ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তৌরাতে মরু অঞ্চলের সবচেয়ে উপকারী জন্তু উটের মাংস ভক্ষণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। এটা যে প্রাণিহত্যা নিরুৎসাহিত করার জন্য করা হয়েছে তা বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না। **কোন পশুর রক্ত ও মাংস যে সৃষ্টিকর্তার নিকট পৌছায় না**, ইসলাম ধর্মের পবিত্র গ্রন্থেও তার উল্লেখ রয়েছে। সৃষ্টিকর্তা পশুর রক্ত-মাংস গ্রহণ করেন না। তিনি কেবল মানুষের হৃদয়ের ভক্তি ও ভালবাসা গ্রহণ করেন। এখানে বলা দরকার যে, খৃষ্টধর্ম বলির পরিবর্তে ভালবাসা, সেবা আর বিশ্বাস স্থাপনের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং বলা হয় এটাই ধর্মের মূল কথা। পরমেশ্বর পরমপিতা শ্রীকৃষ্ণের ওপর বিশ্বাস স্থাপন, তাঁর নির্দেশ মানা এবং জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শনের কথা ইস্‌কনও বলে। তবে খৃষ্টভক্তদের বলা আর কৃষ্ণভক্তদের বলার মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গিগত কিছু পার্থক্য রয়েছে। জীবে দয়া প্রদর্শন কখনো প্রাণী মেরে কিংবা হত্যা করে হয় না। পাশ্চাত্যের ইহুদি-খৃষ্টান সমাজে প্রভুপাদ একথাটা সর্বপ্রথম যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে তুলে ধরতে ও বোঝাতে সমর্থ হন। তাদের কাছে প্রাণিহত্যার বিরুদ্ধে প্রমাণ তুলে ধরেন তিনি তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল থেকে। তিনি বলেন, "বাইবেলের 'তুমি কাউকে হত্যা করবে না (Thou Shall not kill)' আদেশটি কেবল মানুষের ক্ষেত্রে নয়; পশু-পাখির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কারণ হত্যা অর্থে যে দু'টি ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তার একটি হল kill এবং অন্যটি Murder. নরহত্যার ক্ষেত্রে Murder শব্দটিই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাইবেলে যেহেতু kill শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেখানে আদেশটি মানুষসহ অন্যান্য সকল প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য বলে গণ্য করতে হবে। আদেশটি শুধু মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে বাইবেলে অবশ্যই Murder শব্দটি ব্যবহৃত হতো। কিন্তু তা তো হয়নি। যীশু খৃষ্ট কিংবা তাঁর অনুগামীরা নিশ্চয়ই অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন না। তাঁরা ভালভাবে বুঝেই সঠিক শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সুতরাং এ আদেশটি নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টির কোন সুযোগই নেই। এর ভাষা খুবই সহজ ও সরল।" প্রভুপাদের এ যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য ইহুদি-খৃষ্টভক্ত-নিরীশ্বরবাদী সমাজের অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হতে থাকে। তাই তারা মদ্য-মাংস ছেড়ে দিয়ে অনেক স্থানে দল বেঁধে হরেকৃষ্ণ বন্দনায় মেতে উঠেন। বিশ্বের সেরা ধনকুবের হেনরি ফোর্ডের প্রপৌত্র আলফ্রেড ফোর্ডও এ দলের একজন সক্রিয় সদস্য। ফোর্ড পরিবারের একজন সুযোগ্য সদস্য যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা না করেই প্রভুপাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অহিংসবাদী হরেকৃষ্ণ আন্দোলনে যোগদান করেছেন, তা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। আসলে হত্যা-সন্ত্রাস-সহিংসতায় বিশ্বটা একেবারে ছেয়ে গেছে এবং একথাটা জোর দিয়ে বলা যায় যে, এর সম্পৃক্ততা রয়েছে মনুষ্যসৃষ্ট চলমান কোন কোন ধর্মের সাথেই। এর আগে অন্য একটি প্রবন্ধে আমি তা স্পষ্টকরে বলেছি। মানুষ শান্তিপূর্ণ ও সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশে বাঁচতে চায়; আর সন্ত্রাসমুক্ত ধর্ম বলতে বর্তমানে ইস্‌কন-প্রদর্শিত সনাতন ধর্মকেই বোঝায়। ইস্‌কন আর যাই হোক হত্যাকে কখনো উৎসাহিত করে না, রক্তপাত ও সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেয় না। আর তাই রক্তপাত ও সন্ত্রাসমুক্ত এক সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও সম্প্রীতিময় বিশ্ব গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই পৃথিবীর নানা প্রান্তের সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা (আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ) ইস্‌কনের সুশীতল ছায়াতলে এসে ক্রমশ সমবেত হচ্ছেন। ●

(৩২ পৃষ্ঠার পর)

৫. হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্রের শব্দতরঙ্গ মনোযোগসহকারে শ্রবন করেও একজন ব্যক্তিরপক্ষে পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হওয়া সম্ভব ঃ পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র শ্রবণ ও কীর্ত্তনের প্রয়োজন রয়েছে। শ্রীমন মহাপ্রভু এই দু'টি বিষয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন।

৬. নাম জপ এবং সংকীর্ত্তন হল পারমার্থিক সেবা বাস্তবায়নের অন্যতম দু'টি মৌলিক নীতিমালা।

৭। ভগবানের নাম জপ এবং শ্রবনের সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসরন না করলে কারো পক্ষেই শুদ্ধ ভক্ত হওয়া সম্ভব নয় ঃ ভগবানের নাম জপ এবং শ্রবণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বিধিমালা রয়েছে। সেগুলো নিজ নিজ গুরুদেবের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে। নতুবা কারোও পক্ষেই শুদ্ধ ভক্তে রূপান্তর হওয়া সম্ভব নয়।

৮। নববিধা ভক্তির মধ্যে ভগবানের দিব্য নাম জপই হল শ্রেষ্ঠ ঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতম-এ নয়ভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবার উল্লেখ রয়েছে ঃ-

শ্রবনং কীর্ত্তনং বিষ্ণু স্মরণং পাদসেবনং
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যম্ সখ্যম আত্মনিবেদনম্।

ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দনা, দাস্য, সখ্য এবং তাঁরকাছে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পন এই নয়টি উপায়ে ভগবানের সেবা করা যায়। এ গুলোর মধ্যে সর্বোত্তম উপায় কোনটি-এই প্রশ্ন সার্বভৌম পন্ডিত শ্রীমন্ মহাপ্রভুকে জিজ্ঞেস করলে, তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'ভগবানের দিব্য নাম জপ করাই-অর্থাৎ কীর্ত্তনই সবচেয়ে উত্তম উপায়।' অর্থাৎ **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে**-এই মহামন্ত্র জপ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীমন মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, ভগবানের সেবায় নয়টি বিধিই শ্রেষ্ঠ। তবে এই নয়টির মধ্যে সর্বোত্তম হল-ভগবানের দিব্য নাম জপ-অর্থাৎ কীর্ত্তন। আর নিরপরাধে কীর্ত্তন করতে পারলে পরমেশ্বর ভগবানের অহৈতুকী কৃপা সহজেই লাভ করা সম্ভব।

শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে বলেছেন, ভক্ত ভগবানের সেবা যেভাবেই করুক না কেন তা অবশ্যই দিব্যনাম জপ সহযোগে হতে হবে।

– চলবে।

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত হল প্রাচীন ভারতের বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের সারাতিসার। পাঁচ হাজার বছর আগে মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পারমার্থিক জ্ঞানের সারভাগ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। এখানে মূল সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত শব্দার্থ, অনুবাদ এবং তাৎপর্যও উপস্থাপন করা হল। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করা হচ্ছে।

প্রথম স্কন্ধ ঃ "সৃষ্টি"

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাসদেবকে শ্রীমদভাগবত সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের নির্দেশ

শ্লোক ১১

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোহঙ্কিতানি যৎ
শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ ॥ ১১ ॥

তৎ-তা ; বাক্-শব্দকোষ ; **বিসর্গঃ**-সৃষ্টি ; **জনতা**-জনসাধারণ ; **অঘ**-পাপ ; **বিপ্লবঃ**-বিপ্লব ; **যস্মিন্**-যাতে ; **প্রতি-শ্লোকম্**-প্রতিটি শ্লোক ; **অবদ্ধবতি**-অনিয়মিতভাবে রচিত ; **অপি**-সত্ত্বেও ; **নামানি**-দিব্য নাম আদি ; **অনন্তস্য**-অন্তহীন ভগবানের ; **যশঃ**-মহিমা ; **অঙ্কিতানি**-চিত্রিত ; **যৎ**-যা ; **শৃন্বন্তি**-শ্রবণ করেন ; **গায়ন্তি**-গান করেন ; **গৃণন্তি**-গ্রহণ করেন ; **সাধবঃ**-সৎ এবং বিশুদ্ধচেতা পুরুষ।

অনুবাদ

পক্ষান্তরে যে সাহিত্য অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, যশ, লীলা ইত্যাদির বর্ণনায় পূর্ণ, তা দিব্য শব্দ-তরঙ্গে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সৃষ্টি, যা এই জগতের উদ্ভ্রান্ত জনসাধারণের পাপ-পঙ্কিল জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা করে। এই অপ্রাকৃত সাহিত্য যদি নির্ভুলভাবে রচিত নাও হয়, তবুও তা সৎ এবং নির্মল চিত্ত সাধুরা শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন এবং গ্রহণ করেন।

তাৎপর্য

মহান চিন্তাশীল ব্যক্তিদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে তারা খারাপের মধ্যে থেকেও ভালটি গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে, বুদ্ধিমান মানুষের বিষভাণ্ড থেকেও অমৃত আহরণ করা উচিত, স্বর্ণ অত্যন্ত নোংরা জায়গা থেকেও গ্রহণ করা উচিত, গুণবতী সতী স্ত্রী অজ্ঞাত কুলশীলা হলেও গ্রহণ করা উচিত এবং অস্পৃশ্য কুলোদ্ভুত হলেও যথার্থ শিক্ষকের কাছ থেকে সৎশিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এগুলি সর্বস্থানে সর্বস্তরে মানুষদের প্রতি কয়েকটি নৈতিক উপদেশ। কিন্তু একজন সাধু হচ্ছেন জনসাধারণের থেকে অনেক উচ্চস্তরের মানুষ। তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তনে মগ্ন, কেন না পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম এবং যশ কীর্তিত হলে জগতের কলুষিত পরিবেশ পবিত্র হয় এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মতো অপ্রাকৃত শাস্ত্রের প্রচারের ফলে মানুষ প্রকৃতিস্থ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই বিশেষ শ্লোকটির ভাষ্য রচনা করার সময় আমাদের একটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশ চীন সামরিক শক্তির সাহায্যে ভারতের সীমান্ত আক্রমণ করেছে। রাজনীতির সাথে আমাদের কোনই সম্পর্ক নেই, তবুও আমরা দেখছি যে পূর্বে ভারত এবং চীন উভয় দেশই পরস্পরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বহু বছর সহাবস্থান করে এসেছে। তার কারণ হচ্ছে যে সেই সময় তারা ভগবৎ চেতনাময় পরিবেশে বাস করছিল, এবং পৃথিবীর প্রতিটি দেশ ছিল ভগবৎ-বিশ্বাসী, নির্মল হৃদয়সম্পন্ন ও সরল এবং তখন কোন রকম রাজনৈতিক কপটতা ছিল না। ভারত এবং চীনের মধ্যে মানুষের বসবাসের অনুপযোগী একফালি জমি নিয়ে বিবাদ করার কোন কারণ ছিল না, এবং অবশ্যই তা নিয়ে যুদ্ধেও নামার কোন প্রয়োজন ছিল না।

কিন্তু কলহের যুগ এই কলির প্রভাবে, যা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, অতি সামান্য বিষয় নিয়েও বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। তার কারণ হচ্ছে এই যুগের অত্যন্ত কলুষিত পরিস্থিতি, একদল মানুষ অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নাম এবং মহিমা কীর্তন বন্ধ করার চেষ্টা করছে। তাই, সারা পৃথিবী জুড়ে ভাগবতের বাণী প্রচার করার এক মহান প্রয়োজন আজ দেখা দিয়েছে। প্রতিটি দায়িত্বসম্পন্ন ভারতবাসীর কর্তব্য হচ্ছে সমস্ত পৃথিবীর পরম মঙ্গল সাধন করে পৃথিবীতে বহু আকাঙ্ক্ষিত শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী প্রচার করা। ভারতবর্ষ যেহেতু তার দায়িত্ব সম্পাদনে অবহেলা করছে, তাই আজ সারা পৃথিবী জুড়ে এই সংকট এবং বিবাদ দেখা দিয়েছে। আমরা নিঃসন্দেহে জানি যে শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রাকৃত বাণী যদি পৃথিবীর নেতৃস্থানীয় লোকেরা গ্রহণ করেন তা হলে অবশ্যই তাঁদের হৃদয়ের পরিবর্তন হবে এবং স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণ তাঁদের অনুসরন করবে। সাধারণত জনসাধারণ রাজনীতিবিদ এবং নেতাদের হাতের ক্রীড়নক ; যদি নেতাদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়, তবে অবশ্যই সমস্ত পৃথিবীর পরিস্থিতির এক আমূল পরিবর্তন হবে। আমরা জানি যে জনসাধারণের হৃদয়ে ভগবৎ চেতনার পুনঃপ্রকাশ করার জন্য এবং সমস্ত পৃথিবীর বুকে ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এই মহান গ্রন্থ

প্রচারে আমাদের চেষ্টা ঐকান্তিক হলেও তাতে বহু অসুবিধা রয়েছে। যথার্থভাবে এই বিষয়টি উপস্থাপন করতে, বিশেষ করে একটি বিদেশি ভাষায়, অবশ্যই ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হবে, এবং আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাতে অনেক ভুলভ্রান্তি থাকবে। কিন্তু তবুও আমরা নিশ্চিন্তভাবে জানি যে আমাদের ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও এই বিষয়টির গাম্ভীর্য যথাযথভাবে বিবেচনা করা হবে। এবং সমাজের নেতারা পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্তনে এক সৎ প্রচেষ্টারূপে তা গ্রহণ করবেন। গৃহে যখন আগুন লাগে, তখন বিদেশী প্রতিবেশীর কাছেও গৃহবাসীরা সাহায্য প্রার্থনা করে, এবং তাদের ভাষায় কথা বলতে না পারলেও তারা তাদের মনোভাব ব্যক্ত করতে পারে এবং তাদের বোধগম্য ভাষায় ব্যক্ত না করা হলেও প্রতিবেশীরাও তাদের প্রয়োজন বুঝতে পারে। সমস্ত পৃথিবীর পাপ-পঙ্কিল পরিবেশে শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রাকৃত বাণী প্রচার করার জন্য সেই ধরনের সহযোগিতারই প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে এটি হচ্ছে পারমার্থিক মূল্য সমন্বিত এক বিজ্ঞান, এবং তাই আমরা তার বিষয়বস্তুর কথাই বিবেচনা করি, ভাষার নয়। এই মহান শাস্ত্রগ্রন্থের বিষয়বস্তু যদি পৃথিবীর মানুষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, তা হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

সারা পৃথিবীর মানুষ যখন জড় বিষয়ের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত হয়ে পড়েছে তখন যে সামান্য কারণেও মানুষে-মানুষে অথবা দেশে-দেশে যুদ্ধ লাগবে, তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। এটি হচ্ছে কলহের যুগ কলিযুগের নিয়ম। সমস্ত পরিবেশ আজ সব রকম পাপে পূর্ণ হয়ে উঠেছে, এবং সকলেই সেটা খুব ভালভাবে জানে। ইন্দ্রিয়-সুখভোগে উপায় বর্ণনা করে কত গ্রন্থ রচিত হয়েছে। পৃথিবীর বহু দেশে অশ্লীল সাহিত্য বর্জন করার জন্য সরকারি বিভাগ রয়েছে। তা থেকে বোঝা যায় যে সরকার এবং দায়িত্বসম্পন্ন নেতারা এই ধরনের সাহিত্য অনুমোদন করেন না, কিন্তু তবুও তা বাজারে বিক্রি হচ্ছে ; কেন না মানুষ ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য সেগুলি চায়। জনসাধারণ পড়তে চায় (সেটি তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি), কিন্তু যেহেতু তাদের মনোবৃত্তি কলুষিত হয়ে গেছে, তাই তারা এই ধরনের সাহিত্য চায়।

এই পরিস্থিতিতে শ্রীমদ্ভাগবতের মতো অপ্রাকৃত সাহিত্য যে কেবল জনসাধারণের কলুষিত মনকেই নিষ্কলুষ করবে তা নয়, উপরন্তু তা তাদের উৎসাহ-দ্যোতক সাহিত্য পাঠের আকাঙ্খাও চরিতার্থ করবে। প্রথমে তা পড়তে তারা অনিচ্ছুক হতে পারে কেন না পান্ডু রোগাক্রান্ত রোগী মিছরি খেতে চায় না, কিন্তু মিছরিই হচ্ছে সেই রোগের ঔষধ। তেমনই, সুপরিকল্পিতভাবে ভগবদগীতা এবং শ্রীমদ্ভাবতের জনপ্রিয়তা বর্ধন করা হোক, যাতে জনসাধারণ তা পড়তে আগ্রহী হয়। তা হলে তা ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনরূপ পাণ্ডুরোগে মিছরির মতো কাজ করবে। মানুষ যখন এই গ্রন্থের রস একবার আস্বাদন করবে, তখন অন্য সমস্ত সাহিত্য, যা প্রকৃতপক্ষে সমাজে বিষ প্রদান করছে, আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে।

তাই আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, বহু ভুল-ভ্রান্তি সহ উপস্থাপন করা হলেও মানব সমাজের প্রতিটি মানুষ শ্রীমদ্ভাগবতকে সাদরে গ্রহণ করবে, কেন না শ্রীনারদ মুনির মতো মহাজন এই অধ্যায়ে আবির্ভূত হয়ে তা গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

শ্লোক ১২

নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্ ॥ ১২॥

নৈষ্কর্ম্যম্–সকাম কর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে আত্মোপলব্ধি; **অপি**–তথাপি; **অচ্যুত**–পরমেশ্বর ভগবান, যিনি তাঁর স্বরূপাবস্থা থেকে কখনও চ্যুত হন না; **ভাব**–ধারণা; **বর্জিতম্**–বর্জিত; **ন**–না; **শোভতে**–শোভা পায়; **জ্ঞানম্**–দিব্য জ্ঞান; **অলম্**–ক্রমশ; **নিরঞ্জনম্**–উপাধিমুক্ত; **কুতঃ**–কোথায়; **পুনঃ**–পুনরায়; **শশ্বৎ**–নিরন্তর; **অভদ্রম্**–অশুভ; **ঈশ্বরে**–ভগবানে; **ন**–না; **চ**–এবং; **অর্পিতম্**–অর্পিত; **কর্ম**–সকাম কর্ম; **যৎ অপি**–যা; **অকারণম্**–কারণ রহিত।

অনুবাদ

আত্মোপলব্ধির জ্ঞান সব রকমের জড় সংসর্গবিহীন হলেও তা যদি অচ্যুত ভগবানের মহিমা বর্ণনা না করে তা হলে তা অর্থহীন। তেমনই যে সকাম কর্ম শুরু থেকেই ক্লেশদায়ক এবং অনিত্য, তা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার উদ্দেশ্যে সাধিত না হয় তা হলে তার কি প্রয়োজন ?

তাৎপর্য

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, ভগবানের দিব্য মহিমাবিহীন সাধারণ সাহিত্যই কেবল নয়; বৈদিক শাস্ত্রাদি নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানও যখন ভগবদ্ভক্তির মহিমা বর্ণনা করে না, তখন তাও নিন্দনীয় বলে বর্জন করা হয়। ব্রহ্মজ্ঞানের যেখানে নিন্দা করা হচ্ছে, তখন ভগবদ্ভক্তিহীন সকাম কর্মের কি কথা ? এই ধরনের কল্পনাপ্রধান জ্ঞান এবং সকাম কর্ম জীবকে কলুষ মুক্ত করতে পারে না। সকাম কর্ম, যাতে প্রায় সমস্ত মানুষই যুক্ত, শুরুতে অথবা শেষে সর্বদাই ক্লেশদায়ক। তা কেবল তখনই সার্থক হতে পারে যখন তা পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তির অনুকূল হয়। ভগবদ্গীতাতেও প্রতিপন্ন হয়েছে যে সেই ধরনের কর্মের ফল ভগবানের সেবায় নিবেদন করা যেতে পারে, তা না হলে তা কর্মবন্ধনে পরিণত হয়। সমস্ত কর্মের যথার্থ ভোক্তা হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, এবং তাই যখন তা জীবের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির উদ্দেশ্যে সাধিত হয়, তখন তা কেবল চরম দুঃখ-দুর্দশায় পর্যবসিত হয়।

শ্লোক ১৩

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্ শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥ ১৩ ॥

অথো–সুতরাং; **মহা-ভাগ**–অত্যন্ত ভাগ্যবান;

ভবান্‌—তুমি; অমোঘ-দৃক্‌—পূর্ণদ্রষ্টা; শুচি—নিষ্কলঙ্ক; শ্রবাঃ—প্রসিদ্ধ; সত্য-ব্রতঃ—সত্যবাদিতার ব্রতপরায়ণ; ধৃত-ব্রতঃ—দিব্য গুণাবলীযুক্ত; উরুক্রমস্য—যিনি অলৌকিক কার্যকলাপ সম্পাদন করতে পারেন (ভগবান); অখিল—সমগ্র বিশ্বের; বন্ধ—বন্ধন; মুক্তয়ে—মুক্তির জন্য; সমাধিনা—সমাধি দ্বারা; অনুস্মর—নিরন্তর চিন্তা কর এবং তারপর তা বর্ণনা কর; তৎ-বিচেষ্টিতম্‌—ভগবানের বিভিন্ন লীলাবিলাসের।

অনুবাদ

হে ব্যাসদেব, তোমার দৃষ্টি সর্বতোভাবে পূর্ণ। তোমার যশ নিষ্কলঙ্ক। তুমি দৃঢ়ব্রত এবং সত্যপ্রতিষ্ঠ। তাই জনসাধারণের জড় বন্ধন মোচন করার জন্য তুমি সমাধিমগ্ন হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের লীলাসমূহ দর্শন করতে পার।

তাৎপর্য

সাহিত্যের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক রুচি রয়েছে। অজ্ঞাত বিষয়ে তারা প্রামাণিক সূত্র থেকে শুনতে চায় এবং পড়তে চায়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তাদের এই রুচির সুযোগ নিয়ে একদল প্রবঞ্চক ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সম্বন্ধীয় সমস্ত সাহিত্য রচনা করছে। সেই সমস্ত সাহিত্য মায়ার দ্বারা প্রভাবিত বিভিন্ন রকমের জড় কবিতা এবং মনোধর্মপ্রসূত দর্শনে পূর্ণ, এবং তাদের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে জড়-ইন্দ্রিয়-ভোগ। এই ধরনের সাহিত্য যদিও সম্পূর্ণভাবে অর্থহীন, তবুও অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের আকর্ষণ করার জন্য তা বিভিন্নভাবে অলঙ্কৃত। এইভাবে জীব সেই সমস্ত সাহিত্যের দ্বারা মোহিত হয়ে কোটি কোটি জন্ম-জন্মান্তরে মুক্তির আশারহিত হয়ে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে। বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীনারদ ঋষি এই ধরনের অর্থহীন সাহিত্যের করাল কবলগ্রস্ত হয়েছে যে সমস্ত মানুষ, তাদের প্রতি অত্যন্ত কৃপাপরবশ হয়ে শ্রীল ব্যাসদেবকে উপদেশ দিলেন ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান সমন্বিত সাহিত্য রচনা করতে, যা কেবল মানুষকে আকৃষ্টই করবে না উপরন্তু তাদের সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্ত করবে। শ্রীল ব্যাসদেব অথবা তাঁর প্রতিনিধিরা এই কার্য সম্পাদনে যথার্থভাবে যোগ্য, কেন না তাঁরা সত্য দর্শন করার যথার্থ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়েছেন। শ্রীল ব্যাসদেব এবং তাঁর প্রতিনিধিরা তাঁদের পারমার্থিক জ্ঞানের প্রভাবে বিশুদ্ধ চেতনাবিশিষ্ট এবং ভগবানের ভক্তি সম্পাদনে দৃঢ়ব্রত; তাঁরা পাপপঙ্কিল জড়জাগতিক কার্যকলাপ থেকে বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর। বদ্ধ জীবেরা নতুন নতুন তথ্য জানবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী এবং শ্রীল নারদ মুনি অথবা ব্যাসদেবের মতো দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন পরমার্থবাদীরা নতুন নতুন জ্ঞান আহরণে উৎসুক মানুষদের অপ্রাকৃত জগতের অন্তহীন সংবাদ প্রদান করতে পারেন। ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে এই জড় জগৎ ভগবানের সৃষ্টির একটি নগণ্য অংশ এবং এই পৃথিবী হচ্ছে জড় জগতের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ।

সমগ্র পৃথিবীতে হাজার হাজার পণ্ডিত রয়েছেন, এবং তাঁরা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে নানা রকম তথ্য প্রদান করার জন্য হাজার হাজার গ্রন্থ রচনা করেছেন। দুর্ভাগ্যবশত সেই সমস্ত গ্রন্থ পৃথিবীতে শান্তি এবং সৌহার্দ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়নি। তার কারণ হচ্ছে সেই সমস্ত শাস্ত্রে পারমার্থিক বিষয়ের অভাব; তাই যে জড় সভ্যতা মানুষের জীবনীশক্তি শোষণ করে এক চরম দুঃখদায়ক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে, তা থেকে জনসাধারণকে উদ্ধার করার জন্য বৈদিক সাহিত্য, বিশেষ করে ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত অনুসরণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভগবদ্গীতা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী, যা ব্যাসদেব লিপিবদ্ধ করেছেন, আর শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাবিলাসের বর্ণনা। এই সাহিত্যই কেবল অন্তহীন দুঃখ-দুর্দশা থেকে মানুষকে মুক্ত করে দিব্য আনন্দ লাভের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করাতে পারে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে সমস্ত জগতের সমস্ত মানুষকে জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থ। পরমেশ্বর ভগবানের এই অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী কেবল ব্যাসদেব এবং তাঁর আদর্শ প্রতিনিধিরাই বর্ণনা করতে পারেন, যাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত সেবায় সম্পূর্ণরূপে মগ্ন। এই ধরনের ভগবদ্ভক্তদের হৃদয়েই কেবল তাঁদের অনন্য ভক্তির প্রভাবে ভগবানের দিব্য লীলাসমূহ স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া, বহু বহু বছর ধরে জল্পনা-কল্পনা করলেও অন্য কেউ ভগবানের কার্যকলাপ সম্বন্ধে জানতে পারে না বা বর্ণনা করতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা এত নিখুঁত এবং যথাযথ যে আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে তাতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে তা আজ ঠিক সেইভাবে ঘটেছে। কেন না এই গ্রন্থের প্রণেতা ত্রিকালদর্শী, তিনি অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দর্শন করতে পারতেন। ব্যাসদেবের মতো মুক্ত পুরুষেরা কেবল তাঁদের দৃষ্টি এবং জ্ঞানেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হননি, তাঁরা তাঁদের শ্রবণে, চিন্তায়, অনুভূতিতে এবং অন্য সমস্ত কার্যকলাপেও পূর্ণতা প্রাপ্ত। মুক্ত পুরুষদের ইন্দ্রিয়গুলি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র, এবং সেই পবিত্র ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই কেবল সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হৃষিকেশের (শ্রীকৃষ্ণের) সেবা করা যায়। তাই শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে বেদের রচয়িতা, সর্বতোভাবে বিশুদ্ধ-আত্মা শ্রীল ব্যাসদেব কৃত পূর্ণ পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য বর্ণনা।

শ্লোক ১৪

ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ পৃথগ্‌দৃশস্তৎকৃতরূপনামভিঃ।
ন কর্হিচিৎক্কাপি চ দুঃস্থিতা মতির্লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদম্‌ ॥ ১৪ ॥

ততঃ— তা থেকে; অন্যথা—ব্যতীত; কিঞ্চন—কিছু; যৎ—যা কিছু; বিবক্ষতঃ—বর্ণনা করতে ইচ্ছুক; পৃথক্‌—ভিন্ন; দৃশঃ—দৃষ্টি; তৎকৃতঃ—তার প্রতিক্রিয়া; রূপ—রূপ; নামভিঃ—নামের দ্বারা; ন কর্হিচিৎ—কখনও নয়; ক্কাপি—যে কোন; চ—এবং; দুঃস্থিতা মতিঃ—চঞ্চল চিত্ত; লভেত—লাভ করে; বাত-আহত—বায়ুতাড়িত; নৌঃ—নৌকা; ইব—মতো; আস্পদম্‌—স্থান।

অনুবাদ

ভগবানকে ছাড়া তুমি আর যা কিছু বর্ণনা করতে চাও, তা সবই বিভিন্ন রূপ, নাম এবং পরিণামরূপে মানুষের চিত্তকে উদ্বিগ্ন এবং উত্তেজিত করবে, ঠিক যেভাবে একটি আশ্রয়বিহীন নৌকা বায়ুর দ্বারা তাড়িত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়।

তাৎপর্য

শ্রীল ব্যাসদেব হচ্ছেন সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রের সম্পাদক, এবং তাই তিনি পারমার্থিক তত্ত্ব বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন, যেমন সকাম কর্ম, জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি। তা ছাড়াও, বিভিন্ন পুরাণে তিনি বিভিন্ন নাম এবং রূপ সমন্বিত বিভিন্ন দেব-দেবীদের পূজা করার পন্থাও বর্ণনা করেছেন। তার ফলে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় মনকে একাগ্র করতে জনসাধারণ একটু বিভ্রান্ত হতে পারে। আত্মজ্ঞান লাভের যথার্থ পন্থা সম্বন্ধে তারা এমনিতেই বিভ্রান্ত। শ্রীল নারদ মুনি শ্রীল ব্যাসদেবের বৈদিক সাহিত্য সংকলনে এই বিশেষ ত্রুটিটি সম্বন্ধে তাঁকে বোঝালেন, এবং তাই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে কেন্দ্র করে সব কিছুর বর্ণনা করতে নির্দেশ দিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবান ছাড়া আর অন্য কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। বিভিন্ন রূপে ভগবান প্রকাশিত হয়েছেন। তিনি হচ্ছেন একটি গাছের মূলস্বরূপ। তিনি হচ্ছেন একটি দেহের উদরস্বরূপ। গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন সমস্ত গাছটিতে জল দেওয়া হয়, উদরকে খাদ্য দিয়ে যেমন সমস্ত দেহে শক্তি সঞ্চার হয়, ঠিক তেমনই ভগবানই হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির মূল। তাই ভাগবত পুরাণ ছাড়া অন্য কোন পুরাণ রচনা করা ব্যাসদেবের পক্ষে সমীচীন হয়নি, কেন না ভগবদ্ভক্তির মার্গ থেকে একটু বিক্ষিপ্ত হলেই আত্মজ্ঞান লাভের প্রচেষ্টায় উপদ্রব সৃষ্টি হতে পারে। যদি একটি ছোট ভ্রান্তির ফলে এইরূপ উপদ্রব সৃষ্টি হয়, তা হলে অদ্বয় তত্ত্ব ভগবানের থেকে ভিন্ন ভাবধারায় স্বেচ্ছাকৃত প্রচারের ফলে যে কি সর্বনাশ হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করার সব চাইতে বড় বিপদ হচ্ছে যে তার ফলে এক বিশেষ সর্বেশ্বরবাদের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলস্বরূপ বহু ধর্ম-সম্প্রদায় গড়ে ওঠে যা জীবের সঙ্গে ভগবানের প্রেমময়ী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। ভগবানের সঙ্গে জীবের এই নিত্য সম্পর্কের প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে তার ভববন্ধন মোচনের একমাত্র উপায়। কিন্তু সর্বেশ্বরবাদের প্রভাবে জীব যখন মনে করে যে, যে-কোন একজনকে পূজা করলে চরমে তার ফল একই হবে, এবং তাই ভ্রান্ত মতবাদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সে যখন ভগবৎ-সেবাবিমুখ হয়, তার পারমার্থিক জীবনের সর্বনাশ হয়। এই সম্পর্কে ঘূর্ণিবায়ু দ্বারা তাড়িত নৌকার দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উপযুক্ত। সর্বেশ্বরবাদীদের বিক্ষিপ্ত মন, তার আরাধনার বস্তু নির্বাচন করতে না পারার ফলে কখনই পূর্ণরূপে আত্ম-জ্ঞান লাভ করতে পারে না।

শ্লোক ১৫

জুগুপ্সিতং ধর্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম ইতীতরঃ স্থিতো ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ ॥ ১৫ ॥

জুগুপ্সিতম্–বিশেষভাবে নিন্দিত; **ধর্ম-কৃতে**–ধর্মের জন্য; **অনু-শাসতঃ**–অনুশাসন; **স্ব-ভাব রক্তস্য**–স্বাভাবিকভাবে অনুরক্ত; **মহান্**–মহান; **ব্যতিক্রমঃ**–ব্যতিক্রম; **যৎ-বাক্যতঃ**–যার নির্দেশ অনুসারে; **ধর্মঃ**–ধর্ম; **ইতি**–এইভাবে; **ইতরঃ**–জনসাধারণ; **স্থিতঃ**–স্থিত; **ন**– করে না; **মন্যতে**–মনে কর; **তস্য**–তার; **নিবারণম্**–নিবারণ; **জনঃ**–তারা।

অনুবাদ

জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই ভোগের প্রতি আসক্ত, এবং ধর্মের নামে তুমি তাদের তাতে আরও অনুপ্রাণিত করেছ। তা বিশেষভাবে নিন্দনীয় এবং অবিবেচকের মতো কাজ হয়েছে। তোমার দ্বারা এইভাবে নির্দেশিত হয়ে তারা ধর্মের নামে প্রবৃত্তি মার্গে লিপ্ত হবে এবং নিবৃত্তি মার্গ আর অনুসরণ করবে না।

তাৎপর্য

এখানে শ্রীল নারদ মুনি মহাভারত আদি শাস্ত্রে বর্ণিত সকাম কর্মপর বিভিন্ন বৈদিক সাহিত্য রচনা করার জন্য শ্রীল ব্যাসদেবকে তিরস্কার করছেন। জন্ম-জন্মান্তরের জড়-জাগতিক আসক্তির প্রভাবে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই জড় জগৎকে ভোগ করার অভিলাষী। মানব জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তারা সচেতন নয়। এই মনুষ্য জীবন হচ্ছে মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একটি সুযোগ। বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবকে তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথ প্রদর্শন করা। বদ্ধ জীব ভগবদ্বিমুখ হওয়ার ফলে চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন যোনিতে আবর্তিত হয়ে দণ্ডভোগ করে। মনুষ্য জীবন লাভ করার ফলে জীবের এই বদ্ধ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার একটি সুযোগ আসে, এবং তাই মনুষ্য জীবনের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এই অবস্থায় ধর্ম-অনুষ্ঠানের নামে ইন্দ্রিয় সুখভোগের পরিকল্পনায় কখনই তাদের অনুপ্রাণিত করা উচিত নয়। মানব জীবনের এই সম্ভাবনা ব্যাহত হলে সমস্ত সমাজ-ব্যবস্থা বিকৃত হয়ে যায়। শ্রীল ব্যাসদেব হচ্ছেন মহাভারত আদি সাহিত্যের আচার্য, এবং তিনি যদি মানুষকে ইন্দ্রিয় সুখভোগে অনুপ্রাণিত করেন, তা হলে পারমার্থিক প্রগতির পথে তা এক মস্ত বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে, কেন না জনসাধারণ তা হলে জড় বন্ধনরূপ জড়জাগতিক কার্যকলাপ থেকে কখনই বিরত হতে চাইবে না। একসময় মানুষ যখন ধর্মের নামে যজ্ঞে অসংখ্য পশুবলি দেওয়া শুরু করেছিল, তখন ভগবান বুদ্ধদেবরূপে আবির্ভূত হয়ে ধর্মের নামে এই পশুবলি বন্ধ করার জন্য মানুষকে বেদ-বিমুখ করেছিলেন। নারদ মুনি তাঁর দিব্য দৃষ্টিতে দর্শন করেছিলেন এবং তাই সেই ধরনের সাহিত্যের তিনি নিন্দা করেছিলেন। মাংসাহারী মানুষেরা এখনও ধর্মের নামে বিভিন্ন দেব-দেবীর কাছে পশুবলি দেয়, কেন না কোন কোন বৈদিক সাহিত্যে বিধিবদ্ধভাবে পশুবলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত নির্দেশের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মাংস আহার থেকে মানুষকে

নিবৃত্ত করা। কিন্তু কালক্রমে সেই উদ্দেশ্যের কথা মানুষ বিস্মৃত হয়েছে এবং তাই আজ সারা পৃথিবী জুড়ে অসংখ্য কসাইখানা গড়ে উঠেছে। তার কারণ হচ্ছে জড়বাদী মূর্খ মানুষেরা বৈদিক বিধি বিশ্লেষণে সক্ষম মানুষদের কথা শুনতে চায় না। বেদে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, প্রচণ্ড কর্ম করা অথবা অপর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহ করা অথবা প্রজাবৃদ্ধি করা মানব জীবনের উদ্দেশ্য নয়। মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় আসক্তি রহিত হওয়া। জড়বাদী মানুষেরা এই সমস্ত নির্দেশ শুনতে চায় না। তাদের মতে যে সমস্ত মানুষ তাদের জীবন-ধারণের জন্য অর্থ উপার্জনে অক্ষম অথবা যে-সমস্ত মানুষ সাংসারিক জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারেনি, তথাকথিত সন্ন্যাস জীবন তাদেরই জন্য।

মহাভারতের মতো ঐতিহাসিক গ্রন্থে অবশ্য নানা রকম জড় বিষয়ের সাথে পারমার্থিক বিষয়েরও আলোচনা করা হয়েছে। মহাভারতে ভগবদ্গীতা রয়েছে। সম্পূর্ণ মহাভারতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্গীতার চরম নির্দেশ-'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' অর্থাৎ, অন্য সব রকম ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল ভগবানের শরণ গ্রহণ করাই হচ্ছে জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু বিষয়াসক্ত মানুষেরা মহাভারতের এই মূল বিষয় ভগবদ্গীতার থেকে রাজনীতি অর্থনীতি এবং জনসেবার প্রতি অধিক আকৃষ্ট। ব্যাসদেবের এই সমন্বয়বাদী মনোভাবের জন্য নারদ মুনি স্পষ্টভাবে তাঁকে তিরস্কার করেছেন এবং তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন যে তিনি যেন সরাসরিভাবে ঘোষণা করেন যে মানব জীবনের পরম প্রয়োজন হচ্ছে অচিরেই ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের কথা অবগত হয়ে তাঁর শরণাগত হওয়া।

রোগগ্রস্ত মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে নিষিদ্ধ খাদ্য আহার করা। সুদক্ষ চিকিৎসক কখনই রোগীকে তার ইচ্ছামত আহার করতে দেওয়ার প্রবণতার সঙ্গে আপোষ মীমাংসা করেন না। ভগবদ্গীতাতে বলা হয়েছে যে, যে মানুষ সকাম কর্মের প্রতি আসক্ত তাকে তার বৃত্তি থেকে নিরুৎসাহ করা উচিত নয়, কেন না ধীরে ধীরে সে আত্মজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হতে পারে। যে সমস্ত মানুষ তত্ত্বজ্ঞানরহিত শুষ্ক জ্ঞানমার্গে অধিষ্ঠিত, তাদের বেলায় এই নির্দেশ প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু যারা ভগবদ্ভক্তির মার্গে অধিষ্ঠিত তাদের এই ধরনের উপদেশের প্রয়োজন হয় না।

শ্লোক ১৬

বিচক্ষণোঽস্যার্হতি বেদিতুং বিভোরনন্তপারস্য নিবৃত্তিতঃ সুখম্।
প্রবর্তমানস্য গুণৈরনাত্মনস্ততো ভবান্দর্শয় চেষ্টিতং বিভোঃ ॥ ১৬ ॥

বিচক্ষণঃ–অত্যন্ত দক্ষ; অস্য–তার; অর্হতি–যোগ্য হয়; বেদিতুম্–বুঝতে পারা; বিভোঃ–পরমেশ্বর ভগবানের; অনন্ত-পারস্য–অসীমের; নিবৃত্তিতঃ–নিবৃত্ত হয়েছেন; সুখম্–জড়-জাগতিক সুখ; প্রবর্ত-মানস্য–আসক্ত জীবদের; গুণৈঃ–জড় গুণের দ্বারা; অনাত্মনঃ–পারমার্থিক জ্ঞান রহিত; ততঃ–সে জন্য; ভবান্–তোমার মতো মহৎ আশয়সম্পন্ন ব্যক্তি; দর্শয়–পথ প্রদর্শন কর; চেষ্টিতম্–কার্য-কলাপ; বিভোঃ–পরমেশ্বর ভগবানের।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান অসীম। জড় সুখভোগের বাসনা থেকে বিরত, অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিরাই কেবল এই পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করার যোগ্য। তাই যারা জড় বিষয়াসক্তির ফলে এই স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেনি, তোমার মতো মহৎ আশয়সম্পন্ন ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনা করার মাধ্যমে তাদের পথ-প্রদর্শন করা।

তাৎপর্য

ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান অত্যন্ত কঠিন বিষয়, বিশেষ করে তা যখন পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য স্বরূপ বর্ণনা করে। এই বিষয়টি সাংসারিক কার্যে অত্যন্ত আসক্ত ব্যক্তিদের বোধগম্য নয়। যাঁরা অত্যন্ত বিচক্ষণ, যাঁরা পারমার্থিক জ্ঞানলাভের দ্বারা জাগতিক কার্যকলাপ থেকে প্রায় বিরত হয়েছেন, তাঁরাই কেবল এই মহৎ বিজ্ঞান অধ্যয়ন করার যোগ্য। ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কেবল দু'একজন পারমার্থিক সিদ্ধিলাভের প্রচেষ্টা করেন, এবং হাজার হাজার সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যে দু'একজন কেবল সবিশেষ ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানকে তত্ত্বকে জানতে পারেন। তাই নারদ মুনি শ্রীল ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিয়েছেন সরাসরিভাবে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনা করতে। সেই বিজ্ঞানে শ্রীল ব্যাসদেব অত্যন্ত পারদর্শী এবং তিনি জড় ইন্দ্রিয়-সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত। তাই তা বর্ণনা করতে তিনিই হচ্ছেন যথার্থ যোগ্য ব্যক্তি, এবং শ্রীল ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামী হচ্ছেন তাঁর আদর্শ গ্রহীতা। শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান, তাই বিষয়াসক্ত জনসাধারণের হৃদয়ে তা ঔষধের মতো কার্য করে। যেহেতু এই শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে, তাই তা পরমেশ্বর ভগবান থেকে অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থটি হচ্ছে শব্দরূপে ভগবানের অবতার। সাধারণ মানুষ তার মাধ্যমে ভগবানের লীলাবিলাসের বর্ণনা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, এবং তার ফলে তারা ভগবানের সঙ্গলাভ করতে পারে এবং ধীরে ধীরে ভবরোগ থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র হতে পারে। স্থান এবং কালের পরিপ্রেক্ষিতে সুদক্ষ ভক্তরা জনসাধারণকে কৃষ্ণভক্তে পরিণত করার জন্য নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন। ভগবানের প্রেমময়ী সেবা অত্যন্ত শক্তিশালী, এবং সুদক্ষ ভক্ত বিষয়াসক্ত জনসাধারণের স্থূল মস্তিষ্কে তা সঞ্চারিত করার বিচক্ষণ উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন। ভগবানের সেবার উদ্দেশ্যে সম্পাদিত ভক্তদের এই ধরনের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ বিষয়াসক্ত মানুষদের মূর্খ সমাজে এক নবজীবনের সূচনা করতে পারে। এই বিষয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এবং তাঁর অনুগামীরা অত্যন্ত কুশলতা অবলম্বন করেছেন। সেই পন্থা অনুসরণ করে এই কলিযুগে কলহপরায়ণ মানব সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে এবং ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ করা যেতে পারে।

– চলবে।

শ্রীনামামৃত

শ্রীপাদ শুভানন্দ দাস হলেন শ্রীল প্রভুপাদের একজন প্রিয় শিষ্য। শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন, শিষ্য শ্রীগুরুদেবের সেবা দুইভাবে করতে পারেন। বপুসেবা এবং বাণী সেবা। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর বিভিন্ন বইতে কৃষ্ণভাবনামৃত এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা তুলে ধরেন। শ্রীপাদ সুভানন্দ দাস প্রভুপাদের তিরোভাবের বেশকিছুদিন পর সেগুলো একত্রিত করে শ্রীনামামৃতঃ পবিত্র নামের সুধা (Sri Namamrta : The nector of the Holy name) শিরোনামে একটি বই সংকলন এবং সম্পাদনা করেন। বই থেকে গুরুত্বপূর্ন অংশ অনুবাদ করে ভক্তবৃন্দের অবগতির জন্য তুলে ধরা হলো।

অনুবাদক ঃ শ্রী মনোরঞ্জন দে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম জপ হল পারমার্থিক জীবনের ভিত্তি

১. পারমার্থিক পথে অগ্রসর হওয়ার মৌলিক নীতিমালা হল ভগবানের পবিত্র নাম জপ ঃ ভগবান কপিলদেব তাঁর মাতা দেবহুতিকে বললেন, একজন ভক্তের উচিত সব সময় পারমার্থিক বিষয় শ্রবণ করা এবং একই সাথে ভগবানের পবিত্র নাম যেন সব সময় জপ করা যায় সে বিষয়ে তার সচেষ্ট থাকা দরকার। প্রত্যেকেরই উচিত "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে"এই মহামন্ত্র নিজে একা বা অন্যদের সাথে একত্রিত বসে জপ করা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পারমার্থিক পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য এই মহামন্ত্র জপের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। (শ্রীমদ্‌ভাগবতম্ (৩/২৯/১৮)।

২. ভগবানের পবিত্র নামজপের মাধ্যমেই ভক্তিমূলক সেবার ভিত তৈরী হয় ঃ যমরাজ যমদূতদের বললেন, ভগবানের পবিত্র নাম জপের মাধ্যমেই ভক্তিমূলক সেবার ভিত্তি তৈরী হয়, যাকে মনুষ্যলোকে জীবিত ব্যক্তিদের জন্য চূড়ান্ত ধর্মীয় নীতিমালা বলা যায়।

শ্রীমদভাগবতম-এ আরোও বলা হয়েছে, সেই ধর্মই শ্রেষ্ঠ-যা এর অনুসারীদেরকে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভালোবাসা জ্ঞাপনের শিক্ষা প্রদান করে। এই ধরনের ধর্মীয় পদ্ধতির প্রারম্ভেই ভগবানের নাম গ্রহন এবং তাঁর পবিত্র নাম-কীর্ত্তন, বিষ্ণু, স্মরণং, বন্দনং, পাদসেবন ইত্যাদির উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। ভগবানের নাম জপ এবং আনন্দে নৃত্য করার পর যে কেউ ক্রমে ক্রমে তাঁর স্বরূপ, লীলা এবং চিন্ময় গুণাবলী দেখতে পারবে। (শ্রীমদ্‌ভাগবতম্ ৬/৩/২২)।

৩. শুদ্ধ বৈষ্ণবের মুখ থেকে ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ করলে ভক্তিমূলক সেবার বীজ অংকুরিত হয় ঃ জীব হল পরমেশ্বর ভগবানের অতি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ। তাদের মধ্যে ভগবানের প্রতি ভক্তিমূলক সেবার মনোভাব প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে। ভগবানের পবিত্র নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনের মাধ্যমেই এই সেবার মনোভাব তাদের মধ্যে জাগ্রত হয়। বদ্ধ জীবদেরকে তাই কোন শুদ্ধ বৈষ্ণবের মুখ থেকে 'হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র' জপ শ্রবনের সুযোগ দিতে হবে। তাহলে এদের পারমার্থিক চেতনা জাগ্রত হতে পারে। এইভাবেই তাদের মন আস্তে আস্তে ভগবানের প্রতি নিবদ্ধ হবে। এই উপায়ে একজনের মন ক্রমশঃ শুদ্ধ হতে থাকবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একেই 'চেত-দর্পন-মার্জনম' বলেন। মন শুদ্ধ হলে অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলো শুদ্ধ হয়। তখন মানুষ নিজের তৃপ্তির বদলে ভগবানের সেবায় ইন্দ্রিগুলোকে নিয়োজিত করতে আগ্রহী হয়। (শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্য ২২/১০৫)।

৪. পবিত্র নাম জপ এবং প্রসাদ গ্রহনের মাধ্যমেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা আরম্ভ হয় ঃ আমাদের জড় ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দেখতে পাইনা, এমনকি তাঁর নামও শ্রবণ করতে পারিনা। কেবলমাত্র পারমার্থিক সেবার মাধ্যমেই আমরা তাঁর সম্পর্কে অনুধাবন করতে পারি।

এই পারমার্থিক সেবা জিহ্বা, চোখ এবং কর্ণ-দ্বারা আরম্ভ হতে পারে। **হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে-এই মহামন্ত্র** জপ করতে অবশ্যই জিহ্বা ব্যবহার করতে হবে। আবার এই জিহ্বাদ্বারাই কৃষ্ণপ্রসাদ গ্রহণ করতে হবে।

আমাদের জড় চোখ দিয়ে আমরা কৃষ্ণকে দেখতে পাইনা, জড় কান দিয়ে তাঁর সম্পর্কে শুনতে পাইনা, জড় হাত দিয়ে তাঁকে স্পর্শ করতে পারিনা। কিন্তু যদি আমরা তাঁর সেবায় আমাদের জিহ্বাকে নিয়োজিত করি, তবে তিনি নিজের স্বরূপ প্রকাশ করে বলবেন,"আমি এখানেই রয়েছি" (কৃষ্ণ ভাবনামৃতের স্বরূপ)।

জিহ্বাকে পরমেশ্বর ভগবানের নাম জপ এবং প্রসাদ গ্রহণে নিয়োজিত রাখতে হবে, তাহলে অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলো নিয়ন্ত্রনে আসবে। তাই জপ হল ঔষধ এবং প্রসাদ হল পথ্য। এই প্রক্রিয়ায় যে কেউ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি তার সেবা আরম্ভ করতে পারে। আর এরূপ সেবা যত বাড়বে, পরমেশ্বর ভগবান ভক্তের কাছে নিজের স্বরূপ ততই প্রকাশ করবেন।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সাত্ত্বিক খাদ্যদ্রব্য নিবেদন করে 'হরে কৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপ করুন এবং নিম্নোক্ত মন্ত্রে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করুন ঃ-

নমো ব্রহ্মন্যদেবায় গো ব্রাহ্মন হিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ

(২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

উপদেশে উপাখ্যান

শকটাসুর বধ

নন্দভবনের সামনেই একটি বিশাল গরুরগাড়ি দাঁড়িয়েছিল। সেখানে নিচে বাচ্চারা বসে খেলা করছিল। মা যশোদা কৃষ্ণকে একটি নরম বিছানায় শুইয়ে সেখানে রেখে কাজকর্মে ব্যস্ত ছিলেন। শিশু কৃষ্ণ আনন্দে হাত পা ছড়িয়ে হাসছিল। সেই সময় মায়াবী এক অসুরকে কংস পাঠিয়েছিল কৃষ্ণকে হত্যা করতে। মায়াবী অসুরটি আকাশপথে উড়ে গেল। তারপর চিন্তা করল, এই শিশু পুতনাকে বধ করেছে। পুতনা এক সুন্দরী রূপ ধারণ করে ওর কাছে গিয়েছিল। কিন্তু আমি কোনও রূপ ধরব না। আমি অদৃশ্যভাবে থাকব। তারপর গাড়িটার মধ্যে ভর করব। এভাবেই শিশুকে চাকার তলায় পিষে ফেলব।

এরকম চিন্তা করেই অদৃশ্যভাবে গাড়িটাতে সে ভর করল। সেই সময় কৃষ্ণ তৃষ্ণার্ত হয়ে কাঁদতে লাগল। হাত পা ছড়াতে লাগল। সেই কোমল শিশুর পদাঘাত গাড়িতে ঠেকল। অসুরটা বুঝতেই পারেনি যে, আচমকা এমন প্রচণ্ডবেগে তার উপর লাথি আসবে। সেই আঘাত খাওয়া মাত্রই গাড়িটা অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে পাক খেতে খেতে মাটিতে পড়ল। আর মাটিতে পড়া মাত্রই একেবারে ভেঙ্গেচুরে গেল। এভাবে মায়াবী অসুরের মৃত্যু হল। শকটে ভর করেছিল বলে তার নাম শকটাসুর।

সব লোকেরা ঘটনাস্থলে দৌড়ে এল। বাচ্চারা বলতে লাগল, কৃষ্ণ ওই গাড়িটা ভেঙ্গেছে। বড়রা হতভম্ব হলেন। নন্দমহারাজ কৃষ্ণকে কোলে তুললেন। তারপর স্বস্তিবাচন পর মা যশোদা শিশুকে কোলে নিয়ে স্তন পান করালেন।

হিতোপদেশ

জগতে শকটাসুরের মতো অনেক ব্যক্তি আছে, যারা গোপনে গোপনে ভগবানকে ফাঁকি দিয়ে ভগবদ্ বিরোধী কর্মে লিপ্ত হয়। তারা মনে করে ভগবান যদি থাকে, তবে আমরাই ভগবানকে শেষ করতে পারব। এইভাবেই তারা সুখী হতে চায়। পরিণামে শকটাসুরের মতো অবস্থা হয়। বুঝতেই পারা যাবে না, কখন ভগবান নিষ্ঠুরভাবে জীবনী শক্তি অকালে হরণ করে নেবেন।

হীরাচোর আর ক্ষীরাচোর

দু'জন চোর রাতে গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ল। বেদম মার খেল। চোর দু'টির মধ্যে কোন সম্পর্ক ছিলনা কিন্তু একই রাতে একই গ্রামে দু'জনেই ধরা পড়েছিল। একজন ধরা পড়ল মাঠে, শশাক্ষেতে শশা চুরি করতে গিয়ে। আর একজন ধরা পড়ল ঘরের ভেতরে, একটি গয়নার কৌটো চুরে করতে গিয়ে।

দু'টি চোরকে ধরে একটি গাছের সঙ্গে বাধা হল। গ্রামের মোড়ল তাদের পেটানোর জন্য লোকদের নির্দেশ দিলেন। তখন চোর দু'টি একে অপরের দোষ দিতে লাগল। যে শশা চুরি করেছিল সে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, 'মোড়ল মশাই', আমি গরীব মানুষ। দু'টি মাত্র শশা চুরি করেছি। আমি তো কারও বাড়িতে চালডাল সোনাদানা চুরি করতে যাইনি। আমাকে বেশী মারবেন না।'

যে গয়না চুরি করেছিল সে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল, 'বাবু মশাই' আমি নাহয় একটু লোভে পড়ে হার চুরি করতে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়েছিলাম। আমি তো কারও ফাঁকা জমির মধ্যে বস্তা নিয়ে শাকসবজি তুলতে যাইনি। আমাকে বেশী মারবেন না।'

তখন মোড়ল মশাই বলতে লাগলেন, 'আরে হীরাচোর আর ক্ষীরাচোর-কে কিসে কম। হীরাচোর কি ক্ষীরা খায় না, নাকি ক্ষীরাচোর হীরা দেখলে তা নেয় না। দু'টোই পাকা চোর। দু'টোকেই এখন পেটানো চলুক।' তখন হীরার মালিক হীরাচোরকে আচ্ছা করে পেটাল, ক্ষীরার মালিক ক্ষীরাচোরকে ভালমতো পেটাল। আর অন্যরা তো দু'জনকেই যথেচ্ছ মার দিয়েছিল।

হিতোপদেশ

আমি কম দোষী, অন্যে বেশী দোষী প্রভাবে যুক্তি দেখিয়ে জীব রক্ষা পেতে পারে না। পাপকর্মের শাস্তি পেতেই হয়। হীরাচোর আর ক্ষীরাচোর একে অন্যের উপর বেশী দোষ চাপিয়েছিল। কিন্তু শাস্তি কেউই কম পায়নি।

আদর্শ গৃহস্থ জীবন লাভের উপায়

এই আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছে কিভাবে আপনি গৃহে থেকে আদর্শ গৃহস্থ জীবন লাভ করতে পারেন

-প্রেমাঞ্জন দাস

গৃহস্থ আশ্রম কাকে বলে ?

পারমার্থিক শ্রীগুরুদেবের আশ্রয়ে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী রূপে যারা থাকতে অসমর্থ হয়, তারা সেই গুরুদেবের আদেশক্রমে বারো বছর পর গৃহে প্রত্যাবর্তন করে বৈদিক বিধানে ধর্মপত্নী গ্রহণ করে দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবেশ করে থাকেন। এই অবস্থার নামই গৃহস্থ আশ্রম।

ধর্মপত্নী সহ গৃহী ব্যক্তিদের কর্তব্য এবং কায়মনোবাক্যে শ্রেয়ঃ আচরণকেই গৃহধর্ম বলা হয়। গৃহী ব্যক্তিকে ধর্মাচরণে সাহায্য করবার জন্যই পত্নীকে সহধর্মিণী বলা হয়ে থাকে। **সহ-ধর্মাচরেদ্ ইতি সহধর্মিণী।**

কেবলমাত্র যৌনসুখ সম্ভোগের জন্য যে দারপরিগ্রহ সাধারণতই কলিযুগে মানুষ করে থাকে তা অবৈদিক, ধর্মাচার ভ্রষ্ট ও পশুজীবনতুল্য। যারা ক্ষণিক সুখ-সম্ভোগের জন্য পত্নীগ্রহণ করে কেবলমাত্র আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন আদিতে মত্ত থাকে, শাস্ত্রে তাদের গৃহস্থ না বলে গৃহমেধী বা গৃহব্রতী বলা হয়েছে। গৃহস্থের ধর্ম আর গৃহমেধীর স্বভাব কখনও এক নয়। কাম চরিতার্থ করার মধ্যেই গৃহমেধীদের চেতনা সীমাবদ্ধ। গৃহস্থরা কৃষ্ণভক্তিময় সংসার গড়ে তোলেন।

ইহলোকে দুই ধরনের মানুষ বাস করছে। দৈব আর অসুর। দৈবভাবাপন্ন মানুষেরা কৃষ্ণভজন করে আর অসুরভাবাপন্ন মানুষেরা কৃষ্ণভজন বাদ দিয়ে থাকে।

গৃহস্থরা দেবভাবাপন্ন, গৃহব্রতীরা অসুরভাবাপন্ন। শ্রীমদ্ভাগবতে প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁর পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলেছেন, "হে পিতা, গৃহব্রতীদের মন গুরু থেকে কিংবা আপনা থেকে কিংবা পরস্পর থেকে কোনও প্রকারে শ্রীকৃষ্ণে নিযুক্ত হয় না। কারণ তারা অজিতেন্দ্রিয়। সুতরাং তারা বারংবার এই দুঃখময় সংসারে প্রবেশ করে চর্বিত বিষয়ই চর্বণ করতে থাকে। তারা গৃহ-দার-পুত্রে আসক্ত হয়ে 'আমি-আমার' করতে করতে ধনসম্পদ আহরণে আতুর হয়, স্ত্রৈণ ও অল্পমতি হয়ে মায়াজালে ক্রমশ অধিকতরভাবে আবদ্ধ হয়। তারা দুঃখভরে বলতে থাকে-'হায়! আমার বৃদ্ধ পিতামাতা, আমার শিশুসন্তানবিশিষ্টা ভার্যা, আমার সন্তানগুলি আমাকে ছাড়া অনাথ অনাশ্রয় হয়ে জীবন ধারণ করবে কিরূপে ? জীবনের অন্তিমেও বিষয়াসক্ত চিত্তে 'আমি-আমার' চিন্তা করতে করতে দেহত্যাগ করে তারপর অন্ধ-তামসিক জীবনে গতি প্রাপ্ত হয়। সেই জন্য স্ত্রী-পুরুষ কারও গৃহমেধী হওয়া উচিত নয়।

গৃহস্থদের বিষয়ে শ্রীপৃথুমহারাজ বলেছেন-

"যাঁদের গৃহে হরিভক্ত সাধুদের সেবার জন্য জল, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যরা বর্তমান থাকে, তাঁরাই প্রকৃত গৃহস্থ। যাদের গৃহে মহাভাগবতগণের পদজল পড়ে না, সেই গৃহ সমস্ত রকমের সম্পদে পরিপূর্ণ হলেও তা সাপের ঘর বলে গণ্য হয়।" ●

গৃহে হরিভজন

গৃহে থেকে কিভাবে হরিভজন করা যায় সেই উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতে দেওয়া হয়েছে।

যে ব্যক্তি মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে জয় করতে যত্নশীল, তিনি গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও নিষ্ঠাপূর্ণভাবে হরিভজন করতে থাকেন। শত্রুরা যেমন দমিত হলে দুর্গে বা যে কোনও স্থানে ইচ্ছামতো বিচরণ করা যায়, তেমনই বুদ্ধিমান ব্যক্তি কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপু জয় করে গৃহে বা বনে যে কোনও স্থানে ইচ্ছামতো বিচরণ করতে পারেন।

মানুষ প্রথমে দুর্গ আশ্রয় করেই প্রবল বিপক্ষীয় শত্রুকে জয় করে থাকে। গৃহ ষড়রিপুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার দুর্গের মতো। কিন্তু গৃহকে দুর্গ না করতে পেরে গৃহ-শত্রুর আগার করে ফেলা হলে বহিঃশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবার স্থান তো দূরের কথা, যুদ্ধে এগোবার আগেই গৃহশত্রুর দ্বারাই পরাজিত হতে হবে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য-এইগুলি হল আমাদের গৃহশত্রু। এই শত্রুগুলো এমন প্রবল হয় যে, গৃহস্থ জীবনের আদর্শটা বিলুপ্ত করে দেয়। এজন্য মানুষেরা কতই না স্বার্থপর হিংসাপরায়ণ ও জঘন্য চরিত্রের হয়ে থাকে। সমাজের প্রায় গৃহগুলিই সাধন-ভজনহীন হয়ে কেবল ইন্দ্রিয় উপভোগের আগার স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ষড়রিপুর সঙ্গে সংগ্রাম করা তো দূরের কথা, ষড়রিপুর দাসত্ব গ্রহণ করা হয়েছে। হরিভজনহীন গৃহ ষড়রিপুর আড্ডাখানা। এইরকম গৃহে বাস করে জীব কিভাবে শান্তি পেতে পারে ? স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতকে শ্রীব্রহ্মা বলছেন, "হে প্রিয়ব্রত! তুমি শ্রীনারায়ণের পাদপদ্ম আশ্রয় করে ষড়রিপুকে বিশেষভাবে জয় করেছ, অতএব এখন গৃহস্থ আশ্রমে অবস্থান করে ভগবানের দেওয়া প্রচুর কৃপা গ্রহণ কর। পরে বনগমন করে শ্রীহরির আরাধনায় একনিষ্ঠ হও।" (ভাগবত ৫/১/১৯) যাঁরা গৃহকে শ্রীহরির নিকেতন করতে পেরেছেন তাঁরাই ষড়রিপুকে জয় করতে পারেন। শ্রীহরিকে কেন্দ্র করে যে গৃহস্থ জীবন গড়ে ওঠেনি, সেই জীবনের পরিণতি বড় শোচনীয়।

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর ছিলেন নিষ্কিঞ্চন ও আকুমার ব্রহ্মচারী। তিনি উল্লেখ করেছেন-

"গৃহে বা বনেতে থাক
'হা গৌরাঙ্গ' বলে ডাক
নরোত্তম মাগে তাঁর সঙ্গ ॥"

যিনি 'হা গৌরাঙ্গ' বলে ডাকেন, অর্থাৎ অকপটে সর্বতোভাবে হরিনাম অনুশীলন করেন, সেই গৃহস্থ ও ত্যাগী বনস্থ ব্যক্তিতে কোন ভেদ নেই।

চিঠিপত্র

প্রশ্নোত্তরে ঃ মনোজ কৃষ্ণ দাস

প্রশ্ন ঃ শ্রীকৃষ্ণের ইহধাম ত্যাগ কিভাবে হয়েছিল ? এ সম্বন্ধে ইস্কনের বইতে কেন বিস্তারিত লেখা হয়নি ? কোন্ গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত বর্ণনা আছে-তা জানাবেন?

প্রশ্নকর্তা-উজ্জ্বল কান্তি রায়, রায়পুর, লক্ষ্মীপুর।

উত্তর ঃ 'ইস্কন'-এর সকল গ্রন্থ নিশ্চয়ই আপনি পড়েন নি। 'ইসকন' স্থপতি শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ বহুগ্রন্থ লিখেছেন এবং গীতা-ভাগবতাদির ভাষ্য করেছেন। আপনি কেবল গ্রন্থকুল প্রদীপ শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ, তৃতীয় স্কন্ধ, একাদশ স্কন্ধ অধ্যয়ন করলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইহধাম ত্যাগের বর্ণিল বর্ণনা পাবেন। এখানে সংক্ষেপ শ্রীকৃষ্ণের ইহধাম ত্যাগের মহিমা উপলব্ধি করুন।

কৃষ্ণদ্বেষী অভক্ত এবং মায়াবাদীদের কাছে ভগবানের অন্তর্ধ্যান বিষয়ে মতবিরোধ আছে। শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর 'কৃষ্ণসন্দর্ভ' গ্রন্থে সেই সমস্ত মুর্খদের সন্দেহ নিরসন করেছেন। শ্রীল জীবগোস্বামী এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাদের টীকায় বৈদিক শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের তাত্ত্বিক বিশ্লেষন করেছেন-

যদ্ধরিরপি তত্যাজ আকৃতিং ত্র্যধীশঃ (ভাঃ ৩/৪/২৮) ভাগবতের এই শ্লোকের 'আকৃতিরম্' শব্দের শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী মহাশয় অর্থ করেছেন-লীলা। আ-অর্থ 'পূর্ণ' ; কৃতিম্ অর্থ 'দিব্য লীলা সমূহ'। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু তাঁর চিন্ময় সত্তা থেকে অভিন্ন, তাই তাঁর দেহ ত্যাগের প্রশ্ন হতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের দিব্যলীলা বিলাসের জন্য ভৌম জগতে আগম এবং নির্গম তাঁর ঐকান্তিক ভক্ত ব্যতীত অন্যের পক্ষে উপলব্ধি করা দুষ্কর। অন্যের কাছে তা কেবল মানসিক যন্ত্রনার হেতু। **অন্যেষাং দুষ্করতরং পশূনাং বিক্লবাত্মনাম্।** ভাঃ ৩/৪/৩৪।। ভাগবতে বলা হয়েছে ; **নিধনমুপগতেষু বৃষ্ণিভোজেষু** অর্থাৎ বৃষ্ণি এবং ভোজবংশীয়রা ব্রহ্মশাপে নিধন হলে ত্রিলোকের অধীশ্বর ভগবান শ্রী হরিও তাঁর ইহলোকিক লীলা সংবরণ করেন। পরবর্তী শ্লোকে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীপাদ বলেন **'ব্রহ্মশাপাপদেশেন কালে না মোযবঞ্চিতঃ'** ব্রহ্মশাপ ছিল ছলমাত্র। মূলতঃ ভগবান তাঁর ইচ্ছামাত্রই ইহলোকের লীলা সাঙ্গ করেন। যে উদ্দেশ্যে ভগবান এ জগতে আগমন করেন সেই উদ্দেশ্য সাধিত হলেই স্বেচ্ছায় ভগবান এ জগৎ থেকে অপ্রকট হন। **ভূভারঃ ক্ষপিতো যেন জহৌ তচচ কলেবরম।** ভাঃ ১/১৫/৩৫।। পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সশরীরেই এই পৃথিবী পরিত্যাগ করেছেন। মুকন্দো ভগবানিমাং মহীং জহৌ স্বতন্বা এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামী লিখেছেন, **'শ্রীকৃষ্ণঃ স্বেচ্ছয়া ধাম স্বতন্বের সমাবিশৎ** ।। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্ব-ইচ্ছায় সশরীরে স্বীয় ধামে প্রবেশ করেছেন।' কোন দেহ রেখে যান নাই। জরাব্যাধের তীর বিদ্ধ হয়ে দেহত্যাগ করেন নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সশরীরে স্বীয় ধামে প্রত্যাগমনের কথা ভাগবতের ১/১৫/৩২,৩৩,৩৫,৩৬, ১/১৪/৮, ৩/৪/২৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৩, ১১/৩১/৫ বিষ্ণু পুরাণে ৫/৩৭/৬৮ এবং মহাভারত মৌষল পর্ব ৪র্থ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ কালীকে পাঠা বলি প্রথা আসলো কোথা থেকে। কলিযুগে এটা শাস্ত্র সম্মত কি না। সমাজে এটা কিভাবে ধর্ম ছড়াচ্ছে বা নেতিবাচক (Negative Effects) প্রভাবগুলো কি কি? বিস্তারিত জানাবেন।

প্রশ্নকর্তা-সুকুমার মল্লিক, সাতকানিয়া-৪৩৮৬, চট্টগ্রাম।

উত্তর ঃ বৈদিক শাস্ত্রে বৈদিক যুগে বলির প্রথা প্রচলনের কথা উল্লেখ আছে। কিন্তু কলিযুগে তা একেবারেই নিষিদ্ধ। মহাপ্রভু শ্রী গৌরাঙ্গ বলেছেন,- **'জিয়াইতে পার যদি তবে মার প্রাণী। বেদপুরাণে আছে হেন আজ্ঞাবাণী।'** অর্থাৎ বেদ এবং পুরাণে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কেউ যদি নবজীবন দান করতে পারে তবে প্রাণী বধের অনুমোদন করা হয়েছে। পুরাকালে শক্তিশালী ব্রাহ্মণেরা বৈদিক মন্ত্রের সাহায্যে প্রাণী বধের পর নবজীবন দান করতে পারতেন। কিন্তু এযুগে কোন শক্তিশালী ব্রাহ্মণ নেই। **কলিকালে তৈছে শক্তি নাহিক ব্রাহ্মণে।** চৈঃ চঃ আঃ ১৭/১৬০, ১৬৩।। তাই বলি নিষিদ্ধ।

শ্রীবাসে করাইলি তুই ভবানী পূজন।
কোটি জন্ম হবে তোর রৌরবে পতন ।।

চৈঃ চঃ আঃ ১৭/৫২ ।।

উপর্যুক্ত শ্লোকের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্যে উল্লেখ আছে বহুতান্ত্রিক, মাংসাহার এবং মদ্যপানের আশায় শ্মশানে ভবানী পূজা করে। এই সমস্ত মূর্খেরা মনে করে যে ভবানীপূজা করা আর শুদ্ধভক্তি সহকারে ভগবানের আরাধনা করা একই ব্যাপার। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তথাকথিত সমস্ত স্বামী এবং যোগীদের জঘন্য তান্ত্রিক কার্য কলাপগুলির নিন্দা করেছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন, "মদ্যপান এবং মাংসাহার করে যে ভবানীপূজা করা হয়। তার ফলে মানুষ নরকগামী হয়। সেই পূজার পদ্ধতিটি নরকীয় এবং তার ফলও নরকীয়। নরক হইতে তোমার নাহিক নিস্তার।। শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/২৬/১৩) বলা হয়েছে, যে মানুষ প্রাণী হত্যা করে, রন্ধন করে, জিহবার স্বাদ মিটায়, মৃত্যুর পর তাকে **'কুম্ভীপাক'** নামক নরকে ফুটন্ত তেলে ভাজা হয়। **'কুম্ভিপাকে পচে, তার নাহিক নিস্তার।'** শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, ম্লেচ্ছরাই মাংশাসী হয়।

মা হিংস্যাৎ সর্বানি ভূতানি-এই বেদবাক্য দ্বারা পশুবলি বা জীব হিংসা নিষিদ্ধ হয়েছে। পশুবধ করা বেদাদেশ নয়।

 কেবল জ্ঞান 'মুক্তি' দিতে নারে ভক্তি বিনা। কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় জ্ঞান বিনা॥

কোন শাস্ত্রে পশুবধ করার আদেশ বা প্রেরণা নাই। ভাঃ ১১/৫/১১।। মা কালী পরমা বৈষ্ণবী। মা কালীর নিকট সবাই তাঁর সন্তান। অতএব সন্তানরূপ পাঠা ছাগলকে মায়ের সামনে বলি দেয়া কোন্ বিচার? কোন ধর্ম? আবার মুর্খরা বলে কিনা বলির পাঠার মাংস মায়ের প্রসাদ! হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর এবং পাষাণ না হলে কেউ পশুবলি দিতে পারে না। মাংস খাদকদের পরিণতি বিষয়ে বলা হয়েছে, 'যে পশুর মাংস খাচ্ছে সেই পশু পরজনমে উপযুক্ত দেহ পেয়ে মাংস খাদক ব্যাক্তিকেও ভক্ষণ করবে।, ভাঃ ১১/৫/১৪।।

প্রশ্ন ঃ সমাজ দর্পনের (কার্ত্তিক-১৪১১ বাং) ১৫৬ পৃষ্ঠায় প্রকৌশলী বাদল কৃষ্ণ চৌধুরী (চট্টগ্রাম) লিখেছেন-"দেব-দেবীর পূজা করলে ঈশ্বরের পূজা হয়। শ্রীমদ্ ভগবদগীতায় বলেছেন যে, যারা ভক্তি সহকারে দেব দেবীর পূজা করেন তারাও ঈশ্বরের পূজা করেন?" উক্ত বক্তব্য শাস্ত্রীয়ভাবে সঠিক কি না জানতে চাই?

প্রশ্নকর্তা-সঞ্জয় পাল, ছাতিয়াইন, হবিগঞ্জ।

উত্তর ঃ বাবু সঞ্জয়, প্রকৌশলী মহাশয়ের পুরো লেখাটি ফটোকপি করে পাঠানো হলে সুবিধা হতো। তবে যেটুকু লিখে পাঠিয়েছেন তাতে এ কথা বলতে চাই যে, শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে তার বক্তব্য পরিস্ফুট নয়। দেবদেবীরা ভগবানের বিভিন্নাংশ, কলাংশ। ভগবানের সেবক-সেবিকা। দাস-দাসী। দেব-দেবীদের পূজা করলে পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের পূজা হয়। প্রত্যক্ষভাবে নয়। মজার বিষয় হল, গীতার যেই শ্লোকটিতে বলা হয়েছে দেব-দেবীর পূজা করলে শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয়, সেই শ্লোকটিতে একথাও বলা হয়েছে যে, সেই পূজা বে-আইনী পূজা। অবিধি পুজা। **যজন্ত্য অবিধি পূর্বকর্ম**। গীতা ৯/২৩ দেখুন।। এই শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে প্রায় ব্যাখ্যা কারেরা দু'টি বিষয় ভুল করেন। প্রথমত, দেব-দেবীর পূজা করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয়-এস্থলে 'শ্রীকৃষ্ণ' উল্লেখ না করে কেবল ভগবান বা ঈশ্বর উল্লেখ করেন। দ্বিতীয়তঃ এরূপ পূজা বিধি সম্মত নয়, অবিধি-এই সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন না। এটা ছলনা বা কূট কৌশল বটে। শুধু তাই নয় গীতাতে আরও বলা হয়েছে, **কামৈস্তৈ স্তৈহৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেহন্য দেবতা** (গীঃ ৭/২০); **অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ ভবত্যল্পমেধসাম** (গীঃ ৭/২৩) অর্থাৎ যাঁদের কাম-কামনা, বিষয় বাসনায় জ্ঞান বিকৃত হয়েছে, তারা এবং অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরা দেব-দেবীদের পূজা করে। তার ফলে তারা দেব-দেবীদের কাছে যায়। দেবতাদের পায়। তারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে যেতে পারে না। ভগবানকে পায় না। প্রমাণ, গীতা-৭/২৩, ৯/২৫ দেখুন। কেননা দেব-দেবী পূজক ঐ বুদ্ধিহীন মানুষেরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানতেই পারেন না। প্রমাণ-গীতা ৭/২৪।। আর পুরাণ শাস্ত্র জানায়-

বাসুদেবং পরিত্যজ্য মোহন্যদেবমুপাসতে।
স্বমাতরং পরিত্যজ্য স্বপচীং বন্দতে হিসঃ।। (স্কন্ধ পুরাণ)

যারা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে পরিত্যাগ করে অন্য দেব দেবীর পূজা বা উপাসনা করে, তারা গর্ভধারিনী নিজের মাকে পরিত্যাগ করে পিশাচীর কোলে আশ্রয় নেয়। আর শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সরস্বতী শ্রীমদ্ভাগবত জানায় **'ভর্তৃস্নেহবিদূরানং যথা জারে কুযোষিতাম'**-দেব-দেবীদের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি বিবাহিত জীবন উপেক্ষা করে উপপত্নী বা উপপতিতে আসক্ত হওয়ার ন্যায়। ভাঃ ৪/১৫/২৫।।

প্রশ্ন ঃ আমাদের এখানে প্রতি বছর চৈত্র মাসে কালী মন্দিরে পাঠা-ছাগল বলি দেওয়া হয়। যেদিন কালীপূজা হয় ঐ রাতে অষ্টপ্রহর কীর্তনের জন্য গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আসন বসিয়ে অধিবাস এবং পরের দিন অষ্টকালীন কীর্তন হয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে একদিকে কালীপূজার পাঠাবলি অন্যদিকে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পার্ষদবৃন্দের বসিয়ে অষ্টকালীন কীর্তন এটা কি শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত মতে ঠিক আছে?

প্রশ্নকর্তা-অজয় পাল, লক্ষ্মীবাজার, জকিগঞ্জ, সিলেট।

উত্তর ঃ অজয় বাবু, কেবল আপনার ওখানেই নয় সারাদেশের যত্রতত্র ঐ অকর্ম সম্পাদিত হয়। যারা কালীমন্দিরে পাঠাবলি দেওয়ার জঘন্য পাপকর্ম সম্পাদন করে, কালী মায়ের সেই সব বাপধনেরা কালীতত্ত্ব দূরের কথা, পাঠা-ছাগল তত্ত্বও জানেনা। ওরা এও জানে না যে যারা মায়ের মন্দিরে পাঠাবলি দিচ্ছে, পর জনমে ওরাও ঐ পাঠা-ছাগল দ্বারা বলি হবে। আর যারা মহাপ্রভুর আসন বসিয়ে অষ্টকালীন কীর্তনের পূর্বে মায়ের দুয়ারে পাঠা ছাগল বলি দেয়, ঐ কালীমা-ই বলি-দানকারী দুরাত্মাদের সবংশে ধ্বংস করে নরকে পাঠিয়ে দেবেন। দয়া করে কলামের দ্বিতীয় প্রশ্ন-উত্তর এ পড়ে নেবেন।

একদিকে কালীপূজার পাঠাবলি অন্যদিকে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পার্ষদবৃন্দের বসিয়ে অষ্টকালীন কীর্তন করা, শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত মতে ঠিক নাই। কলিযুগে-বলি নিষিদ্ধ হয়েছে। শেষ কথা বলি, এই প্রশ্নোত্তরে কারও অভিযোগ অনুযোগ থাকলে লিখুন। প্রমান চাইলে উত্তর পাঠানো হবে। অথবা যারা বলি দেন তাদের নিকট কলিযুগে কালী পূজায় পাঠাবলি দেওয়া যাবে এরূপ প্রামাণিক শাস্ত্রের প্রমান থাকলে লিখে পাঠাতে অনুরোধ রইল। ধন্যবাদ, মা কালীর দুয়ারে পাঠাবলি দানকারীদের। ধন্যবাদ, প্রশ্নকর্তা মহাশয়কে। হরে কৃষ্ণ।।

প্রশ্ন ঃ শ্রীচৈতন্য ভাগবতে উল্লেখ আছে, মহাপ্রভু তাঁর মাতাকে বলেছিলেন তিনি কলিযুগে আরো দুইবার এই ধরাধামে আসবেন। এই দুইবার কখন ও কোথায় আসবেন?

প্রশ্নকর্তা-প্রদীপ কুমার দাস, পুরাতন বাজার, পটুয়াখালী।

উত্তর ঃ মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ তাঁর মাতাকে অনুরূপ কথা বলেছেন। তবে কখন এবং কোথায় আসবেন এমন কথা বলেন নাই। বলেছেন, অবিলম্বে আসবেন। চৈতন্য ভাগবত পড়লে আপনিও জানতে পারবেন। মহাপ্রভু তাঁর মাতৃদেবীকে যা বলেছেন তা এইরূপ-

আরো দুইজন্ম এই সংকীর্তনারম্ভে।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে।।

ব্যাসাভিন্ন শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর কেন এভাবে মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ আগমনের শুভবার্তা পরিবেশন করলেন-

এ বড়ই গূঢ় রহস্যময়। সমস্যা হল পূর্বাপর বিচার না করে চৈতন্যভাগবতের উক্ত বক্তব্যের দোহাই দিয়ে এপার-ওপার বাংলায় প্রায় ডজন খানেক নবীন গৌরাঙ্গ নকল অবতার, ভূয়া ভগবানের দাবীদার। পরিতাপের বিষয় প্রখ্যাত দার্শনিক এবং ব্রহ্মচারী উপাধিতে বিভূষিত জনৈক বৈষ্ণবাচার্য পর্যন্ত উক্ত বক্তব্যকে নির্ভর করে তার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতাকে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের অবতার দাবী করেছেন। তিনিও পূর্বাপর বিবেচনা করেন নাই। কপটতার আশ্রয় নিয়েছেন। মহাপ্রভু তাঁর মাতৃদেবীকে উক্ত কথা বলার পর পলকে বলেছেন-

মোর অর্চ্চা মূর্তিমাতা, তুমি সে ধরণী।
জিহবারূপা তুমি মাতা, নামের জননী।।
এই দুই-জন্ম মোর সঙ্কীর্ত্তনারম্ভে।
দুই ঠাঞি তোর পুত্র রহুঁ অবিলম্বে।। চৈঃ ভাঃ ২৭/৪৭।।

কপটতার আশ্রয় গ্রহণকারী ব্যক্তিরা চৈতন্য ভাগবতের এই চার লাইন উল্লেখ না করে প্রথম দুই লাইন, আরো দুই জন্ম............'বলেই দেশের জনগণকে বাজিমাৎ করতে চায়। অথচ উপরে পরিষ্কারভাবে বলা হচ্ছে, মহাপ্রভু 'অর্চাবিগ্রহরূপ' এবং 'নামরূপ' এই দুই রূপে আবির্ভূত হবেন। রক্ত মাংসে গড়া শ্মশানগামী জড়দেহে আবির্ভূত হবেন না। চৈতন্য মহাপ্রভু তিরোধানের পর যে সমস্ত অবতার দাবীদার, তারা সকলে শ্মশানে গিয়েছেন। মহাপ্রভু সেরূপ শ্মশানে যাওয়া ভূতে পাওয়া ভগবান ছিলেন না।

আরো দুই জন্ম..........? এই শ্লোকের 'গৌড়ীয় ভাষ্য' এইরূপ-শ্রী গৌরসুন্দর বলিলেন, "আমার এই প্রকার আরও দুইটি অবতার হইবে। ভগবন্নাম-কীর্তনের সহিত আমি অবতীর্ণ হই ; আর আমার সচ্চিদানন্দ রূপ প্রদর্শন করবার জন্য আমি অর্চনাকারীর নিকট আনন্দরূপ অর্চায় আবির্ভূত হই।" পাষণ্ডী মৎসর স্বভাব জনগণ শ্রীগৌরসুন্দরের আরও দুই অবতারের ছলনায় শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অর্চার পরিবর্তে কদর্যশীল মানবগণকে ভগবান শ্রী, গৌরসুন্দরের অবতাররূপে স্থাপন করে।

"অর্চা' ও 'নাম' এই দুইরূপ' বাক্যটি, তাহাদের আদরের বিষয় হয় না। এইরূপ নব গৌরাঙ্গবাদ স্থানে স্থানে উৎপন্ন হওয়ায় পরমার্থের পথ বহু পরিমাণে রুদ্ধ ও ব্যাহত হয়েছে।

অর্চা-মূর্তি মৃন্ময়ী প্রভৃতি হয়ে থাকে আর ভগবন্নাম শব্দাত্মক, সুতরাং শচীনন্দনের দুই অবতার-অর্চাবতার ও নামাবতার। 'কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার' (চৈঃ চঃ আঃ ১৭/২২) ইহাই গৌর সুন্দরের বাণী। অর্চা-বিগ্রহ শ্রীস্বরূপ ও শ্রীনামের সহিত অভিন্ন "নাম বিগ্রহ, স্বরূপ-তিন একরূপ। তিন ভেদ নাহি, তিন চিদানন্দরূপা"। চৈঃ চঃ মধ্য-১৭ অধ্যায়' ইতিমধ্যে ইস্কন-এর প্রচার প্রসারের ফলে সারা-বিশ্বে 'অর্চা বিগ্রহ' এবং 'নামরূপে' মহাপ্রভুর দুই জন্ম লীলা চলছে।

প্রশ্ন ঃ (ক) শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কি কি নামে সম্বোধন করা হয়েছে। দয়া করে জানাবেন।

(খ) অর্জুনকে কি কি নামে সম্বোধন করা হয়েছে।

প্রশ্নকর্তা -ত্রয়ী সাহা (পিতু), দেশওয়ালিপট্টি, কুমিল্লা।

উত্তর ঃ (ক) পরমতত্ত্ববস্তু শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত নামাবলীতে বিভূষিত। অনন্ত কৃষ্ণের নাম অনন্ত মহিমা। কোন নাম তাঁর গুণ বাচক, কোন নাম রূপ প্রকাশক, কোন নাম তাঁর কার্যাবলী বা অপ্রাকৃত লীলাত্মক। শ্রীকৃষ্ণের সকল দিব্য নামসমূহ তাঁর মতই ক্ষমতা সম্পন্ন। তাই নাম এবং নামী অভিন্ন। যা হোক, শ্রী অর্জুন মহাশয় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে সকল দিব্য নামে সম্বোধন করেছিলেন সংক্ষেপে তা নিম্নরূপ-

(১) **কৃষ্ণ-ভগবদ্গীতার** ১/২৮, ৩১, ৪০, ৫/১, ৬/৩৪, ৩৭, ৩৯, ১১/৪১, ১৭/১, ১৮/৭৮ শ্লোকে। (২) **কেশব**-ভঃ গীঃ ১/৩০, ২/৫৪, ৩/১, ১০, ১৪, ১১/৩৫, ১৩/১, ১৮/৭৬। (৩) **কেশিনিসূদন**-ভঃ গীঃ- ১৮/১। (৪) **কমলপত্রাক্ষ**-ভঃ গীঃ ১২/২। (৫) গোবিন্দ- ভঃ গীঃ-১/৩২, ২/৯। (৬) **পরমেশ্বর**-ভঃ গীঃ ১১/৩, ১৩/২৮। (৭) **পুরুষোত্তম**- ভঃ গীঃ ৮/১, ১০/১৫, ১১/৩, ১৫/১৮, ১৯। (৮) **পরমব্রহ্ম**-ভঃ গীঃ ১০/১২। (৯) **প্রভু**-ভঃ গীঃ ৫/১৪, ৯/১৮, ২৪, ১১/৪, ১৪/২১। (১০) **পুরাণ পুরুষ**- ভঃ গীঃ ১১/৩৮। (১১) **প্রপিতামহ**- ভঃ গীঃ ১১/৩৯। (১২) **ভগবান**-ভঃ গীঃ ১০/১৪, ১৭। (১৩) **ভূতেশ**- ভঃ গীঃ ১০/১৫। (১৪) **হরি**-ভঃ গীঃ ১১/৯, ১৮/৭৭। (১৫) **হৃষীকেশ**-ভঃ গীঃ ১/১৫, ২০, ২৪, ২/৯, ১১/৩৬, ১৮/১। (১৬) **ঈশ্বর**-ভঃ গীঃ ৪/৬, ১৫/১৭, ১৮/৬১। (১৭) **বিষ্ণু**-ভঃ গীঃ ১০/২১, ১১/২৪, ৩০। (১৮) **বাসুদেব**-ভঃ গীঃ ৭/১৯, ১০/৩৭, ১১/৫০, ১৮/৭৪। (১৯) **বিশ্বমূর্তি**- ভঃ গীঃ ১১/৪৬। (২০) **বিশ্বরূপ**-ভঃ গীঃ ১১/১৬। (২১) **বিশ্বেশ্বর**- ভঃ গীঃ ১১/১৬ (২২) **বার্ষ্ণেয়**- ভঃ গীঃ ১/৪০, ৩/৩৬। (২৩) **মধুসূদন**- ভঃ গীঃ ১/৩, ২/১, ২/৪, ৬/৩৩, ৮/২। (২৪) **মাধব**- ভঃ গীঃ ১/১৪, ৩৬। (২৫) **মহাত্মা**-ভঃ গীঃ ১১/১২, ২০, ৩৭, ৫০, ১৮/৭৪। (২৬) **মহাযোগেশ্বরহরি**- ভঃ গীঃ ১১/৯। (২৭) **মহাবাহ**- ভঃ গীঃ ১/৩, ২/১, ৪,৬/৩৩, ৮/২। (২৮) **যোগেশ্বর**-ভঃ গীঃ ১১/৪, ১৮/৭৫। (২৯) **যোগেশ্বর কৃষ্ণ**- ভঃ গীঃ ১৮/৭৮। (৩০) **যোগীন**- ভঃ গীঃ ১০/১৭। (৩১) **যাদব**- ভঃ গীঃ ১১/৪১। (৩২) **শাশ্বতপুরুষ**- ভঃ গীঃ ১০/১২। (৩৩) **জগৎপতি**- ভঃ গীঃ ১০/১৫। (৩৪) **জনার্দন**- ভঃ গীঃ ১/৩৫, ৩৮, ৪৩, ৩/১, ১০/১৮। (৩৫) **জগন্নিবাস**- ভঃ গীঃ ১১/২৫, ৩৭, ৪৫। (৩৬) **দেবেশ**- ভঃ গীঃ ১১/২৫, ৩৭, ৪৫। (৩৭) **দেববর**- ভঃ গীঃ ১১/৩১। (৩৮) **দেবদেব**- ভঃ গীঃ ১০/১৫। (৩৯) **অচ্যুত**-ভঃ গীঃ ১/২১, ১১/৪২, ১৮/৭৩। (৪০) **অনন্ত**- ভঃ গীঃ ১০/২৯, ১১/১১, ৩৭, ৪৭। (৪১) **অনন্তরূপ**- ভঃ গীঃ ১১/৩৮। (৪২) **অনন্তবীর্য**- ভঃ গীঃ ১১/১৯, ৪০। (৪৩) **অপ্রতিমপ্রভাব**-ভঃ গীঃ ১১/৪৩। (৪৪) **অমিত বিক্রম**- ভঃ গীঃ ১০/৪০। (৪৫) **অরিসূদন**-ভঃ গীঃ ২/৪। (৪৬) **আদিদেব**-ভঃ গীঃ ১১/৩৮, ১০/১২।

উত্তর ঃ (খ) ভগবদগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনের প্রায় সকল নাম সমূহে সম্বোধন করেছেন। অর্জুন মহাশয়ের নামাবলীর তালিকা নিম্নে বর্ণিত হল-

(ক) **কৌন্তেয়**-ভঃ গীঃ ২/১৪, ৩৭, ৬০, ৩/৯, ৫/২২, ৬/৩৫, ৭/৮, ৮/৬, ১৬, ৯/৭, ১০, ২৩, ২৭, ৩১। (খ) **কুরুনন্দন**-ভঃ গীঃ ২/৪১, ৬/৪৩, ১৪/১৩। (গ) **কপিধ্বজ**-ভঃ গীঃ ১/২০। (ঘ) **কিরীটী**- ভঃ গীঃ ১১/৩৫। (ঙ) **কুরুপ্রবীর**- ভঃ গীঃ ১১/৪৮। (চ) **কুরুশ্রেষ্ঠ**-ভঃ গীঃ ১০/১৯। (ছ) **কুরুসত্তম**-ভঃ গীঃ ৪/৩১। (জ) **পার্থ**-গীতার বহুস্থানে এ নামের উল্লেখ আছে। (ঝ) **পুরুষ ব্যাঘ্র**- ভঃ গীঃ ১১/৩। (ঞ) **পান্ডব**- ভঃ গীঃ ১/১৪, ২০, ৪/৩৬, ৬/২ ইত্যাদি। (ট) **পরন্তপ**- ভঃ গীঃ ২/৩, ৯, ৪/২, ৫, ৩৩, ৭/২৭, ৯/৩, ১০/৪০, ১৮/৪। (ঠ) **পুরুষর্ষভ**- ভঃ গীঃ ২/১৫। (ড) **ভরতর্ষভ**- ভঃ গীঃ ৩/৪১, ৭/১১, ৮/২৩, ১৩/২৭, ১৪/১২, ১৮/৩৬। (ঢ) **ভারতশ্রেষ্ঠ**- ভঃ গীঃ ১৭/১২। (ণ) **ভারত**- ভঃ গীঃ ২/১৪, ১৮, ২০, ৩০, ৩/২৫, ৪/৭, ৪২, ৭/২৭, ১১/৬, ১৩/৩, ৩৪, ১৪/৩, ৮, ৯, ১০, ১৫ ইত্যাদি ছাড়াও অন্যস্থানে এ নামে সম্বোধিত হয়েছেন। (ত) **মহাবাহু**- ভঃ গীঃ ২/২৬, ৬৮, ৩/২৮, ৪৩, ৫/৩৬, ৬/৩৫, ৭/৫, ১০/১, ১৪/৫, ১৮/৫। (থ) **ধনঞ্জয়**-ভঃ গীঃ ১/১৫, ২/৪৮, ৪৯, ৪/৪১, ৭/৭, ৯/৯, ১০/৩৭, ১১/১৪, ১২/৯, ১৮/৭২। (দ) **সব্যসাচী**- ভঃ গীঃ ১১/৩৩। (ধ) **গুড়াকেশ**- ভঃ গীঃ ১/২৪, ২/৯, ১০/২০, ১১/৭। (ন) **দেহভৃতামবর**- ভঃ গীঃ ৮/৪। (প) **অর্জুন**-এ নামে গীতায় বহুস্থানে বিঘোষিত হয়েছেন। (ফ) **অনঘ**- ভঃ গীঃ ৩/৩, ১৪/৬, ৮, ১৫/২০।

প্রশ্ন ঃ সাধু লোকের অল্প নিন্দা বহুলোকে গায়' কেন ?

উত্তর ঃ সংস্কৃতে একটি কথা আছে, 'সজ্জনা গুনমিচ্ছন্তি দোষ মিচ্ছন্তি পামরা।' গুণীজন গুণের প্রশংসা করেন। দোষের মাঝেও গুণ খুজে বের করেন। গুণীজনে গুণী চেনেন। এঁরাই সজ্জন। আর যারা গুণীদের মাঝেও দোষ খোঁজেন, দোষের ছিদ্র না থাকলেও ছিদ্র বের করেন-এরূপ পর ছিদ্রান্বেষণকারীরাই পামরা। নিন্দুক। পাষণ্ডী। পরচর্চা-পরগিবত গাওয়াই এদের সহজাতবৃত্তি। আর সাধুদের ক্ষেত্রে একটু ইদিক-উদিক তাকালেই নিন্দুকেরা তো নিন্দা করবেই। যেহেতু তাদের কাজই নিন্দা করা। এছাড়া সাধারণ মানুষেরা পর্যন্ত অমন মহৎ সাধু সজ্জনদের নিন্দায় পঞ্চমুখ হয়। যদিও ঐ সকল সাধুদের শ্রীচরণের জুতো বহনের ক্ষমতা তাদের নাই।

"সোনা যদি বিষ্ঠা মধ্যে পতিত হয়, তাহা হলে কি তাহার গুণ নষ্ট হয় ? গঙ্গা জলে যদি বিষ্ঠা ভেসে যায়, তাহলে কি তাহার জল অপবিত্র হয় ? সে জলে কি ভগবৎ পূজা হয় না ? অতএব সাবধান, ভগবদ্ভক্তকে কখনো প্রাকৃত মনুষ্য বুদ্ধি করে তাহাদিগকে নিন্দা করিও না। শুন, শাস্ত্র কি বলিতেছেন-

দৃষ্টৈঃ স্বভাবজনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ
ন প্রাকৃতত্বমিহ, ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।

যাহারা সজ্জন তাহারাই সজ্জনের আদর জানেন। নদীয়া।"

তবে, এ কথা সত্য যে, সাধুর রাজ্যে প্রবেশ করে কেউ যদি আপন স্বার্থ হাসিল করে অথবা ধর্মপ্রাণ সরল মানুষদের প্রতারিত করে তবে তার নিন্দা হওয়া স্বাভাবিক। সাধুর বেশে অন্যকে প্রতারিত করা অত্যন্ত সহজ। এদের প্রতিহত করা কর্তব্য, তবে নিন্দামন্দ করে নয় শাস্ত্রীয় যুক্তি প্রমাণের মাধ্যমে। আবার সাধু সজ্জন ব্যক্তিদের সাবধান থাকা কর্তব্য যাতে, নিন্দুকেরা নিন্দার সুযোগ পেয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে না আনে। জগতের মানুষ যে পথে চলে আজীবন, সাধু ব্যক্তিদের সে পথ নয়। সাধু মহাত্মারা চলেন ভিন্ন পথে। সাধুদের অনেক কথা সাধারণ মানুষের নিকট নিমের তেতো, হরিতকীর কষ, মায়ের বকুনি, শিক্ষকের বেত্রাঘাতের মত লাগে। তাই সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে সাধুদের একটু-আধটু-ইদিক-উদিক হলেই নিন্দুকেরা নিন্দায় মুখর হয়। যদিও সমাজের অনেক লোক তার চেয়েও জঘন্য কাজ করে, সেক্ষেত্রে নিন্দুকদের ভ্রুক্ষেপ নাই। আর নিন্দুকেরা সাধারণত হরি বিমুখ হয়, তাদের চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা-মন-বুদ্ধি সবই বিকৃত। তারা নিজেরা অসংখ্য দোষ যুক্ত হলেও অন্যের সামান্য দোষ দর্শনেই তাদের মাথা গরম হয়ে যায়। অবশ্য নিন্দুকেরা সাধুদের নিন্দা করে নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনে। সাধু-সজ্জনদের কোনক্ষতি হয় না। তারা ভগবানের সুরক্ষিত ঢালে রক্ষিত। **ন মে ভক্তঃ প্রনশ্যতি।**

বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, অধুনা তথাকথিত বৈষ্ণব সমাজেও নিন্দুকের সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়েই চলছে। এখন সাধুও সাধুর নিন্দা করে। ব্রহ্মচারী ব্রহ্মচারীর নিন্দা করে। গুরুভাই গুরুভাইয়ের নিন্দা করে। যেন গুরুভাই-এ - গুরুভাই এ- ঠাই ঠাই।

প্রশ্ন ঃ মন্দিরের আশেপাশে অথবা ভক্তগণ যেখানে থাকেন সেখানকার লোক নিন্দুক হয় কেন? কেন তারা ভাল মানুষ হতে পারে না ?

উত্তর ঃ জগতে কপটের সংখ্যা বেশী। এখানে প্রায় সকলে শঠ, প্রবঞ্চক, পরনিন্দুক। শুধু তাই নয়, এখানে খাঁটি জিনিষের গ্রাহক কম। নকল জিনিষের গ্রাহক বেশী। **গোরস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠল বিকায়।** সাধু লোকের সমাদর এখানে নাই বললেই চলে। তাই পেঁচা সদৃশ অসাধু অসৎ প্রকৃতির লোকেরা কৃষ্ণ সূর্যের আলোয় আলোকিত ভগবদ্ভক্তদের ঔজ্জল্য সহ্য করতে পারে না। ভগবদ্ভক্তদের চরণে অপরাধ করায় ওরা পাষণ্ডীতে পরিণত হয়। নিন্দুক, পাতি নিন্দুক, মহানিন্দুক হয়।

এছাড়া ভগবদ্ভক্তদের জীবন-যাপন সাধারণ লোকদের ন্যায় নয়। তারা ২৪ ঘন্টাই কৃষ্ণভাবনাময় জীবন যাপন করে। মন্দিরের আশেপাশে লোকদের নিকট সবচেয়ে আপত্তিকর বিষয় হল ভগবদ্ভক্তরা ভোর রাতে জেগে মঙ্গলারতি করে, তাতে যে ঘন্টা কাশী খোল করতাল, শঙ্খ বাজানো হয় তাতেই মন্দিরের আশে পাশের লোকেদের ঘুমের বারোটা বাজে। সাধুদের মঙ্গলারতি অসাধুদের নিদ্রা তথা ইন্দ্রিয় তর্পনে বিঘ্ন ঘটায়। সেই জন্যেও নিন্দামন্দ করতে পারে। গ্রামাঞ্চল থেকে শহরের এই সমস্যা আরো প্রকট। এরূপ বিবিধ কারণে মন্দিরের আশেপাশে অথবা ভক্তদের গৃহের আশে পাশের লোকেরা নিন্দুক হয়। ●

কুইজ প্রতিযোগীতা

গত সংখ্যায় বর্ণিত প্রশ্নসমূহের উত্তর নিম্নরূপ ঃ

১। যে সমস্ত ব্যাক্তি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তত্ত্ব উপলব্ধি না করে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করে ঐ সমস্ত জড় পন্ডিতদের শ্রীল প্রভুপাদ গর্দভ সদৃশ বলেছেন।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তিনটি ষটক্ রয়েছে। কর্মষটক্, ভক্তিষটক্, জ্ঞানষটক্।

৩। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বাদশ অধ্যায় ১৩নং এবং ১৪নং শ্লোকে শুদ্ধ ভক্তের গুণাবলীর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

৪। অর্জুন মহাশয় একই সাথে দু'হাতে বান ছুঁরতে দক্ষ ছিলেন বিধায় তাকে সব্যসাচী বলা হয়েছে।

৫। পরমেশ্বর ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থান করেন, সেটি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায় ৬১নং শ্লোকে ব্যক্ত করা হয়েছে।

গত সংখ্যায় বর্ণিত প্রশ্নসমূহের উত্তরদাতাদের মধ্য হতে বিজয়ী হলেন ঃ

প্রথম – শ্রী ধীরেন্দ্র চন্দ্র আচার্য্য। গ্রাম- উত্তর খয়রাকুড়ি, পোঃ- হালুয়াঘাট, জেলা- ময়মনসিংহ।

দ্বিতীয় – কাঞ্চনাসখী দেবী দাসী, প্রযত্নে- মুস্তাফিজুর রহমান (এ্যাডভোকেট) পাটোয়ারী বাড়ীর রাস্তা, সুধারাম থানা, পূর্ব মাষ্টারপাড়া, মাইজদী বাজার, নোয়াখালী।

কুইজ প্রতিযোগীতার নিয়ম হলো ঃ প্রতিটি প্রতিযোগীতায়ই মোট ৫টি করে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেয়া থাকিবে এবং প্রতিটি প্রশ্নেরই সঠিক উত্তর প্রদান করতে হবে। যারা প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর প্রদানে সমর্থ হবেন, তাদের মধ্যহতে লটারির মাধ্যমে দু'জনকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

প্রথম বিজয়ীকে ত্রৈমাসিক "অমৃতের সন্ধানে" পত্রিকাটি ২বৎসর এবং দ্বিতীয় বিজয়ীকে ১বৎসর বিনামূল্যে পাঠানো হবে।

চলতি সংখ্যায় প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ ঃ

১। কিভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার যথাযথ মর্ম উপলব্ধি করা যাবে ?

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা কেন শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র ?

৩। কুরুক্ষেত্রের ধর্মক্ষেত্র কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ কেন ?

৪। রাজা দূর্যোধন সেনাপতি দ্রোণাচার্যের কাছে গেলেন-এর মর্মার্থ কি ?

৫। কৌরবপক্ষের পরাজয়সূচক লক্ষনগুলো কি কি ?

উপরোক্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর আগামী ১৫ই ডিসেম্বর এর মধ্যে অবশ্যই 'অমৃতের সন্ধানে' ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

মন্ত্র গুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ। তাঁহার চরণ আগে করিয়ে বন্দন ॥

সম্পাদকীয়

ভবরোগ নিরাময়ের উপায়

সুদক্ষ চিকিৎসক ঔষধ ও পথ্যের দ্বারা তাঁর রোগীর চিকিৎসা করেন। যেমন, অত্যধিক দুগ্ধজাত দ্রব্য আহারের ফলে পেটের অসুখ হয়; কিন্তু সেই দুগ্ধেরই রূপান্তর দধি অম্ল কয়েকটি ঔষধের সঙ্গে গ্রহণ করার ফলে সেই রোগের উপশম হয়। তেমনই, জাগতিক কার্যকলাপের দ্বারা ত্রিতাপ দুঃখ নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু সেই কার্যকলাপ যখন ভগবৎ-সেবায় রূপান্তরিত হয়, তখন আগুনের সংস্পর্শে লোহা যেমন আরক্তিম হয়ে আগুনের প্রকৃতি গ্রহণ করে, তেমনই যখন কোন কিছু ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয় তখন তা সমস্ত জড় ধর্ম পরিত্যাগ করে চিন্ময় তত্ত্বে পর্যবসিত হয়। সেটিই হচ্ছে পারমার্থিক জীবনে সাফল্যের রহস্য। জড় জগতের উপর আধিপত্য করার চেষ্টা করা উচিত নয়, আবার জড় বস্তু পরিত্যাগ করাও উচিত নয়। সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হচ্ছে সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় ব্যবহার করা। সবই হচ্ছে ভগবানের সম্পত্তি, এবং তাঁর অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তিনি চেতনকে জড়ে পরিণত করতে পারেন এবং জড়কে চেতনে পরিণত করতে পারেন। সুতরাং (তথাকথিত) সমস্ত জড় বস্তু পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় শক্তির প্রভাবে তৎক্ষণাৎ চেতনে রূপান্তরিত হয়। এই ধরনের পরিবর্তন সাধনের পন্থা হচ্ছে তথাকথিত জড় বস্তুকে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিয়োগ করা। সেটিই হচ্ছে আমাদের ভবরোগ নিরাময়ের উপায়, এবং তা করার ফলে আমরা চিন্ময় স্তরে উন্নীত হতে পারি, যেখানে কোন দুঃখ নেই, অনুশোচনা নেই এবং ভয় নেই। এইভাবে সব কিছুই যখন ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়, তখন আমরা অনুভব করতে পারি যে, সবই পরম ব্রহ্মময়। "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-এই মন্ত্রটি আমরা এইভাবে উপলব্ধি করতে পারি।

সকাম কর্ম, যা জীবকে নিরন্তর জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখে, তাকে ভগবদ্গীতায় একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, কেন না তার মূল অত্যন্ত গভীর। যতক্ষণ পর্যন্ত কর্মফল ভোগ করার প্রবৃত্তি থাকে, ততক্ষণ জীবকে তার কর্ম অনুসারে এক দেহ থেকে আর এক দেহে দেহান্তরিত হতে হয়। সুখভোগের প্রবৃত্তি ভগবানের সেবা করার বাসনায় রূপান্তরিত করা যায়। তা করার ফলে মানুষের কর্ম কর্মযোগে পরিণত হয়, অর্থাৎ তার স্বাভাবিক প্রবণতা অনুসারে কর্ম করে সে পারমার্থিক সিদ্ধি লাভ করতে পারে। সব রকমের সকাম কর্ম এবং অন্যান্য কর্মের ফল যখন পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় উৎসর্গীকৃত হয়, তখন তার ফলে কর্মবন্ধন বিনাশ হয়ে ধীরে ধীরে অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবার বিকাশ হয়, যা কর্মরূপী সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলটি কেবল ছেদনই করে না, উপরন্তু তা অনুষ্ঠানকারীকে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে নিয়ে যায়।

এর সারমর্ম হচ্ছে সর্বপ্রথমে মানুষকে সেই সব শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভের জন্য অনুসন্ধান করতে হবে, যাঁরা কেবল বেদান্তবিদই নন, উপরন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞ এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনন্য ভক্ত। সেই সাধুসঙ্গে, কনিষ্ঠ ভক্তকে অবশ্যই দৈহিকভাবে এবং মানসিকভাবে প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করতে হয়। এই সেবা-প্রবৃত্তির প্রভাবে মহাত্মারা তাদের প্রতি আরও কৃপা-পরবশ হয়ে তাঁদের কৃপাবর্ষণ করেন, যার ফলে কনিষ্ঠ ভক্তের হৃদয়ে সেই সমস্ত শুদ্ধ ভক্তের সমস্ত দিব্য গুণাবলী প্রকাশিত হয়। তার ফলে ধীরে ধীরে তাদের পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত কার্যকলাপ শ্রবণে গভীর আসক্তি জন্মায়, এবং তখন মানুষ তার স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পেরে তারও ঊর্ধ্বে তার শুদ্ধ আত্মার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, এবং পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে তার নিত্য সম্পর্কের কথা অবগত হতে পারে। এই সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলে শুদ্ধ ভক্তির ক্রমবিকাশ হয় এবং অবশেষে নির্বিশেষ ব্রহ্ম ও পরমাত্মার স্তর অতিক্রম করে পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রকাশিত হয়। ভগবদ্গীতায় বর্ণিত এই সমস্ত পুরুষোত্তম-যোগে অনুশীলনের প্রভাবে যে কোনও অবস্থায় অধিষ্ঠিত মানুষ পরম সিদ্ধি লাভ করতে পারে এবং তখন তাদের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবানের সব রকম দিব্য গুণাবলী প্রকাশিত হয়। এমনই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্ত-সঙ্গের চিন্ময় প্রভাব। ●

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম। সেহ এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম॥

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানলীলা